সতী অসতী

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়

বিশ্ববাণী প্রকাশনী । কলকাতা-৯

শ্রীগণেশচাঁদ দে

শ্রদ্ধাস্পদেষু—

ভয়েল ব্লাউজের হাতায় সাদা সুতোর ফুল তোলা। ঘড়ির ব্যাণ্ডটা মোটা—ঘড়িটাও ঠিক লেডিজ নয়—আবার পুরুষালিও নয়।

কাল পরশু ছু'দিনের জোড়া বাংলা বনধ্। আমায় আজ সকাল সকাল ফিরতে হবে।

ছুটির পর আসব?

কি করতে? আমার কোথাও বসার সময় নেই হেমন্ত। তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে বাজার করাতে হবে ছু'দিনের। মায়ের জন্যে ওষুধ আনিয়ে রাখতে হবে। হাঁপানির মত পাজি রোগ আর দেখি নি।

তোমার সঙ্গে বাজারে যাব?

এবার হেসে ফেলল রাজেশ্বরী। ওই ভিড়ের ভেতর! গরম। চীৎকার। সেখানে তুমি কি করবে?

তোমার পাশে পাশে থাকব। কোন কথা বলব না। তোমার গায়ের গন্ধ পাব।

সে তো ঘাম। মাছের বাজার! পাগলামি করো না লক্ষ্মীটি। আজও বরং অফিসের পর ঘর খুঁজে দেখ পাও কি না।

তোমাকে পেয়েছি কিনা তাতো আজও ঠিকমত জানি না।

মুখ তুলে তাকালো রাজেশ্বরী। একটা দাগ নেই কোথাও। সারা মুখে আলো পড়ে থাকে বলে ছটা বেরোচ্ছিল। হেমন্তর ভেতরটা টনটন করে মুচড়ে উঠল। সে পরিষ্কার বুঝলো, রাজেশ্বরীর ছুই বুকের মাঝখান থেকে একখানা কালো পাথর আস্তে আস্তে জেগে উঠছে। সেখানে হাজার মাথা খুঁড়লেও পাথরখানা আস্তে আস্তে যেমন জেগে উঠছে—তেমন জাগতেই থাকবে।

পেয়েছো গো! পেয়েছো! বলেও রাজেশ্বরী অল্পক্ষণের জন্যে হেমন্তর মুখখানা দেখে থমকে গেল। চশমার কাঁচের ভেতর থেকে ছু'খানা আচ্ছন্ন চোখ ক্রমেই ঝাপসা হয়ে আসছে। মাথার চুল খানিক এলোমেলো। তার চেয়ে বোধ হয় ছোটই দেখাচ্ছে এখন

হেমন্তকে। পুওর! পুরুষমানুষের এই অবস্থাটা দেখে দেখে রাজেশ্বরীর এখন একঘেয়ে লাগে। তবে ভালোও লাগে।

এটা অফিস। উপরন্তু ডালহৌসি। সে এখন হেমন্তর সামনে কৌটো খুলে গপ্ গপ্ করে টিফিন গিলতে পারবে না। সে জানে হাঁ করে খাওয়ার সময় তার মুখের ভেতরটা কতখানি দেখা যায়! কিন্তু না খেয়েও উপায় নেই। শরীরটাকে রাখতে হবে; রাখতেই হবে। বড় আশ্চর্য লাগে রাজেশ্বরীর। এই শরীর এমন একটা জিনিস—যাকে রঙীন জামা-কাপড়ে, রঙে হাসিতে ফ্যাশনে মুড়ে মেঘ, বৃষ্টি, আলোর মত একবার মেলে ধরতে পারলে জীবনটা গুঞ্জনে, কূজনে ভরে যায়।

খুব আলগোছে অফিস বাঁচিয়ে রাজেশ্বরী হেমন্তর কাঁধে হাত রাখল। এবার অফিস যাও। আমেদাবাদে একটা লাইন চেয়েছি। এখুনি আসবে। আমার বসে থাকলে চলবে না।

তা তুমি কাজ করনা। আমি বলতে চাই—আমি তোমায় পাই নি!

নিজের সীটে উঠে যেতে যেতে রাজেশ্বরী বলল, সে হিসাব-নিকাশ পরে হবে। এখন তুমি যাও।

না। যাব না। আমি জানতে চাই—রোজ অফিসের পর তুমি কোথায় যাও? কার সঙ্গে যাও? আমাকে কিছুতেই সঙ্গে যেতে দাও না কেন?

বাঃ! পুরুষমানুষ! এখুনি অধিকার ফলাতে শুরু করেছ তাও তো আমাদের বিয়ে হয় নি।

বিয়ে ছাড়া সবই তো হয়ে গেছে রাজেশ্বরী। এবার হেমন্ত বুঝলো সে হেল্পলেস হয়ে পড়ছে। তবু বুক ঠুকে বলল, বিয়ের আর বাকি কি!

রাজেশ্বরীর মুখ এখন স্রেফ পাথর। বুকের ভেতরকার কালচে পাথরখানা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। হেসে খুব কঠিন করে বলল, না

হেমন্ত। সবই বাকি। অত সহজে এবার আর আমি তোমার ব্যাপারে ভুল করছিনে।

এবার মানে এখনকার। তাহলে সেবার বলে একটা কিছু আছে। তা বারো-তেরো বছর আগেকার। তখনকার হেমন্ত অন্যরকম ছিল। সে তখন অনেক সুবিধাজনক অবস্থায় ছিল।

তুমি এত কঠিন কেন রাজেশ্বরী!

মোটেই না। তোমাকে তো এবার আমি চান্স দিয়েছিলাম। তুমি যদি কাজে লাগাতে না পার—তাহলে আমি কি করব?

চান্স! চান্সই বটে।

হেমন্ত আর একটাও কথা বলল না। এয়ারকুলার বসানো রিসেপসন থেকে বেরিয়ে গরম লিফটে ঢুকে পড়ল। এক একজন মানুষ এক এক রকম ইচ্ছে নিয়ে এই বাক্সটায় ঢোকে। কেউ যাবে সিক্সথ ফ্লোরে। কেউ উঠবে ফিফথ ফ্লোরে। আশা নিরাশার এক একটা লেভেল। ব্রেবোন রোডে হাজার হাজার লোক ফুটপাথ ধরে টিফিন করছে। তার ভেতর দিয়ে পাঁচ ফুট সাড়ে আট ইঞ্চি লম্বা মানুষটা অফিসের দিকে এগোল। একেবারে গেটে ওজন নেওয়ার যন্ত্র বসেছে নতুন। ওজনের টিকিটের পেছনে ভাগ্য লেখা থাকে। হেমন্ত উঠে দাঁড়িয়ে ওজন নিল। সত্তর কে. জি। টিকিটের পেছনে লেখা: You always pine for what you had once. নিজের সিটে বসে পেছনের জানলাটা আগে আটকে দিল। নিচেই শেয়ার মার্কেটের চেঁচামেচি। হেমন্তর সি. সি. আর ভাল। চাকরি এখনো একুশ বছর। চাই কি এবারই অ্যাসিস্ট্যান্ট সেকরেটারির পোস্টে পারমানেন্ট হয়ে যেতে পারে। আজ দেড় বছর। রাজেশ্বরীর সঙ্গে ফিরে দেখা হওয়ার পর আজ এই দেড় বছর কিভাবে যে কেটে গেল তা বলতে পারবে না হেমন্ত।

কিছু ফাইল শেষ করে অফিসের বারোয়ারি ডিকসনারিটা নিয়ে পড়ল। ইংলিশ টু বেংগলি। এ. টি. দেবের। পুরো নাম আশুতোষ

দেব। স্টুডেন্টস্ ফেবারিট ডিকসনারি। দু'শো তিরিশ পৃষ্ঠায় চান্স কথাটা খুঁজে পেল। নাউন হলে দৈব। দি ওয়ে থিংস্ হ্যাপেন। আকস্মিক ঘটনা। অপ্রত্যাশিত ঘটনা। সম্ভাবনা। সুবিধা। ভাগ্য। অদৃষ্ট। ঝুঁকি লওয়া। হঠাৎ সংঘটিত। দৈবক্রমে। হঠাৎ দেখা বা সাক্ষাৎ পাওয়া। যথেষ্ট সম্ভাবনা বা আশা থাকা। ভাগ্য-পরীক্ষা।

ডিকসনারি বন্ধ করে হেমন্ত সিওর হয়ে গেল—ডিকসনারিখানা লেখার আগে রাজেশ্বরী রায়চৌধুরীর সঙ্গে নিশ্চয় আশুতোষ দেবের দেখা হয়েছিল। না হলে সব ক'টা কথা খেটে যায় কি করে? রাজেশ্বরী তার কাছে এখন স্রেফ দৈব। দি ওয়ে থিংস্ হ্যাপেন। অদৃষ্ট।

এই তো সেদিন। মাত্র দেড় বছর আগে। আবার হঠাৎ দেখা। এখন তার মনে হল—দেখা না হলেই ভাল ছিল। ব্যাপারটা এখন ভাগ্যপরীক্ষায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে। স্রেফ লটারি।

খানিক অভিমান। খানিক রাগ। সব মিলিয়ে একটা ধরা পড়ে যাওয়ার লজ্জায় হেমন্ত মিত্র চোখ বুজে ফেলল। চান্স! যে জিনিসটি রাজেশ্বরী আজকাল কৃপাপ্রার্থীদের ওপর মাঝে মাঝে বর্ষণ করে। তারই নাম চান্স।

এক কলিগের বাড়ির চাবি হেমন্তর কাছে ছিল। কলিগ সপরিবারে পুরী গেছে। এই তো সেদিন—মাত্র ক'মাস আগে সন্ধ্যের মুখে মুখে সেখানে গিয়ে উঠল রাজেশ্বরীকে নিয়ে। অনেক দিনের বন্ধ ফ্ল্যাট। দরজা খুলে কয়েকটা জানলা খুলে দিল। পাখা চালালো। আলো জ্বালালো। কলিগের গিন্নি গোছালো। মিটসেফে কৌটোর ভেতর তাজা বিস্কুট পাওয়া গেল। রাজেশ্বরী সব খুঁজে-পেতে চা বানালো। হেমন্ত কলিগের সহধর্মিণীর ড্রেসিং টেবিলে সেন্টের শিশি পেয়ে কয়েক ফোঁটা বুকে ঢেলে নিল।

দু'জনই যেন এ বাড়ির বাসিন্দা—সেইভাবে সিপ করে করে চা

॥ দুই ॥

বাবা আজ মা এসেছিল। তুমি আজ দেরি করলে—

চা দিয়েছিল তোমার জেঠিমা ?

হ্যাঁ। সঙ্গে বিস্কুট ছিল। এই ছাখো আমার জন্যে স্কুলের স্যুটকেশ, টিফিন বাক্স---

বাঃ! খুব সুন্দর তো। একটা একটা করে দেখল হেমন্ত। তার বড়বৌদি এসে চা দিল। দিয়ে বলল, বাসু আবার এসেছিল।

হুঁ।

অনেকদিনের পুরনো দেওরকে সুধা তুই বলেই ডাকে। এ বাড়িতে বিয়ে হয়ে এসেছে অনেকদিন। তার ছেলে বড় হয়ে বিয়ে করে অন্যত্র উঠে গেছে। দাদা বৌদিকে নিয়ে হেমন্ত থাকে। বাসবীও ছিল এই সংসারে। সংসার তারই ছিল। কিন্তু রাখতে পারে নি।

অন্তত হেমন্ত তাই মনে করে। বাসুর এখানে কিছুরই অভাব ছিল না। ছেলে, স্বামী, ভাশুর, জা মিলিয়ে চলে যাওয়ার মত একটা সংসার পেয়েছিল বাসবী।

হাজার হোক মা। তাই সময়ে অসময়ে সুশান্তকে দেখতে চলে আসে। কোন দিন টফি, কোনদিন গল্পের বই—আজ স্কুলের স্যুটকেশ দিয়ে গেছে। বাক্সটা নেড়ে-চেড়ে দেখল। তাতে সুন্দর হরফে রঙ দিয়ে লেখা—সুশান্ত মিত্র, ক্লাস সিক্স-এ।

সেকশনও জানে বাসু ? সুধার চোখে পড়ে গেল। হ্যাঁরে তোর মা কি স্কুলে যায় না কি তোর কাছে। হেমন্তর দিকে ফিরে বলল, হেডমাস্টারকে বলে বারণ করে রাখিস নি ?

বলা তো আছে!

জেঠিমা ঘর থেকে বেরিয়ে গেলে সুশান্ত তার বাবার কাছে এসে গা ঘেষে দাঁড়াল। মা এখানে থাকে না কেন বাবা ?

তুমি কি আজও তোমার মায়ের কোলে উঠেছিলে ?

জোর করে কোলে নিলে আমি কি করব !

চুমু খেয়েছিল তোমাকে ?

হুঁ। খেলে আমি কি করব !

তুমি খাও নি তো ?

মাথা নাড়তে গিয়ে থেমে গেল সুশান্ত। হ্যাঁ খেয়েছি। হেমন্তর কোলের ভেতরে মাথা গুঁজে ছিল সুশান্ত। ছেলের পিঠে হাত বোলাতে বোলাতে হেমন্ত সামনের দেওয়ালে তাকাল। বাসবীকে নিয়ে দুর্গাপুর ব্যারাজের ওপর ওই ছবিটা তুলেছিল। তখনো সুশান্ত আসে নি।

তখন প্রায়ই দু'জনে এদিক ওদিক বেড়াতে বেরোতো। বাসবীর একটা ভঙ্গী খুবই মনে পড়ে। সাহাবাদের ভূতুড়ে ডাকবাংলোর বারান্দায় পাশেই একটা টগর গাছ ছিল। তাতে কি ফুল কি ফুল। সকালবেলাতেই বাসবী বড় মত দু'টো টগর গুঁজে নিয়ে বেণী বাঁধতে বসেছিল। ডাকবাংলোর বারান্দাটা নির্জন। ঘুম ভেঙে উঠে এই ছবিটা প্রথম দেখেই আজও তার মনে গেঁথে আছে।

তুমি মাকে নিয়ে এসো বাবা।

মা কিছু বলেছে ?

না। আমি বলছি।

সুশান্তর মাথায় হাত বোলাতে গিয়ে হেমন্ত নিজের মনে মনে দু'বার বলল, তা হয় না। তা হয় না। তার এই ছেলেটির ওপর বাড়িতে দাবি অনেকের। বড় ভাই রেবতী, বৌদি সুধা, সে নিজে এবং পুরনো কাজের লোক কানাইয়ের। সুশান্ত ডাকে কানাইদা। কানাই বাজারে গেলে যে মাছে কাঁটা নেই—তাই নিয়ে আসবে সুশান্তর জন্যে আলাদা করে। আর দাবি আছে বাসবীর। এত কাণ্ডের পরেও সে দাবি অস্বীকার করা যাচ্ছে না কিছুতেই।

একদিন গভীর রাতে—ঠিক স্বপ্ন বলে মনে হয় সুশান্তর—আবছা মত—বিছানায় উঠে বসে তার বাবা চেঁচাচ্ছিল। তুমি আগে বল নি কেন বাসু। আগে বল নি কেন।

তার মা তখন খাটের কোণে দাঁড়িয়ে কাঁদছিল। ছেলেকে জেগে যেতে দেখে দু'জনেই থেমে গিয়েছিল।

অত রাতে কিছু করার ছিল না হেমন্তর। তাই আলো নিভিয়ে চোখ খোলা রেখে বিছানায় পড়েছিল। পাশে বাসবী। একবার তার গায়ে হাত রাখতে এসেছিল সে-রাতে। হেমন্ত সরিয়ে দেয়। অথচ এই বাসবীর জন্যেই—

সাহাবাদ থেকে বেরিয়ে ফিরেই প্রথম নজরে পড়েছিল হেমন্তর। বছর ত্রিশ বত্রিশের এক ছোকরা—ঠিক ছোকরা বলা যায় না—অনেকটা বাবু ক্লাসের—প্রায়ই বাসবীদি বাসবীদি বলে একেবারে তাদের শোয়ার ঘরে বসে গল্প করে। গল্পের বই পড়তে দিয়ে যায়। লাইব্রেরি থেকে বই পালটে আনে। একবার হাকোবা লেস যোগাড় করে দিয়েছিল অনেকটা। এমনিতে খারাপ কিছু নয়। কিন্তু দু'এক সময় বড় ইরিটেটিং লাগত।

একদিন যে অবস্থায় ওদের দু'জনকে পেল—তারই নিজের শোবার ঘরে—তাতে বাসবীকে এ বাড়িতে আর ঠাঁই দেওয়া যায় না। ছোকরার গেঞ্জীর কল ছিল। বড়বাজারে দু'গ্রোস গেঞ্জী আর আট গ্রোস জাঙ্গিয়া ডেলেভারি দিত রোজ—বের করে দেবার পর বাসবী সেই গেঞ্জী কলের দোতলায় গিয়ে উঠল। সেও আজ বছর দেড়েক আগের কথা। সেপারেশন হয় নি। ডাইভোর্স হয় নি। কিন্তু বছর দেড়েকের উপর হেমন্ত আর বাসবী দু'জন আলাদা লোক। দু'টো পার্ক—একটা থানা—তিনটে রাস্তার ফারাকে এখন বাসবী একটা গেঞ্জী কলের ওপরের ঘরে থাকে। কলকাতা এখনো ঠিক আগের মতই বয়ে যায়। কিছুই পাল্টায় নি।

ঠিক এই সময়েই রাজেশ্বরীর সঙ্গে ফিরে দেখা হল।

অথচ এই বাসবীর জন্যেই রাজেশ্বরীকে একদিন। বারো তেরো বছর আগে।

কলেজ থেকে বেরোবার আগে আগেই রাজেশ্বরীর সঙ্গে হেমন্তর খুব ভাব হয়ে যায়। খুব ঠাণ্ডা, পাতলা ধরনের মেয়ে ছিল। ভবানীবাবুর একই মেয়ে রাজেশ্বরী। ওরা থাকতো ভবানীপুরে কাঁসারীপাড়ায়। পৈতৃক শরিকানি বাড়ি। সিমেণ্ট করা উঠোন। তাতে নানান সম্পর্কের নানান কর্তা বিকেলে ফতুয়া গায়ে দিয়ে পাশা খেলত। মোড় থেকে পাশার দান শোনা যেত—কচ্চে বারো—।

সেই বংশে ভবানী রায়চৌধুরী ছিল ঘরজামাই। আলিপুরের উকিল। মস্ত চেহারা। ভোমা গোঁফ। কালো রঙ। মাথাটা আগাগোড়া টাক। পৈতের সঙ্গে ন'টা আঙটি গেরো দিয়ে রাখতেন ভবানীবাবু। পসার ছিল না। কোর্টফেরত ন্যাশনাল লাইব্রেরির দিককার নির্জন রাস্তা দিয়ে বাড়ি ফেরার পথে আঙটি ঝোলানো পৈতেটি কানে জড়িয়ে পেচ্ছাপ করতে বসতেন।

সেই অবস্থায় হেমন্ত অনেকবার দেখেছে ভবানীবাবুকে। রাতে ভদ্রলোকের অন্য মূর্তি। ভবানীপুরের সবচেয়ে বনেদী থিয়েটার পার্টিতে রিহারসেল দিতেন। দু'একটা বইতে মোশন মাস্টার ছিলেন। কোন বইতে একবার কালে খাঁর রোলে নেমেছিলেন। বইয়ের নাম মনে নেই। হেমন্তকে টিকিট কেটে দেখতে হয়েছিল। তাছাড়া একবার সিনেমায় নেমেছিলেন। শিকারের ছবি। তাতে হাতি ছিল। ভবানীবাবু অঙ্কুশ হাতে মাহুত সেজেছিলেন।

সেই সময়ে এই বিচিত্র বাড়িতে হেমন্ত মিত্তির রাজেশ্বরী রায়চৌধুরীর কাছে যেত। সে বাড়িতে এসব নিয়ে কেউ কোনদিন মাথা ঘামায় নি। হরেক চিড়িয়ার আবাস ছিল বাড়িটা। পলিটিকস্, ব্যায়াম, হোমপ্যাথি, ওকালতি—নানা কিসিমের নানা লোক ছিল। সবাই সবার জ্ঞাতি। সেটা ভালো বোঝা যেত কেউ মরলে অশৌচের সময়। তখন নানা প্রকারের সাদা ও কালো দাড়ি পুরুষদের গালে

ক'দিন ধরে গজাতো। এরকম বাড়িতে খুবই সযত্নে হেমন্তকে চা দিতেন রাজেশ্বরীর মা। তাঁর আশা, ছেলেটি যদি সত্যিই জামাই হয়। এমন পরিবেশে হেমন্ত বেশ ওপেন হ্যাণ্ড পেয়েছিল।

বিরাট শরিকানী বাড়িতে রাজেশ্বরীদের ছিল তিনখানা ঘর। বাইরে বারোয়ারি বৈঠকখানার একদিকে কাঠের পার্টিশনের আড়ালে ভবানীবাবুর সেরেস্তা। ভেতরে তিনখানা ঘরের একখানিতে ছোট দু'ভাই পড়তে বসত। সামনে বড় পড়ার ঘরখানিতে ভবানীবাবুর শোবার খাট খালি পড়ে থাকত। সেখানে বসে রাজেশ্বরী কথা বলত। হেমন্ত লোডশেড্ হলে মোমবাতি খুঁজে না পাওয়া অবধি দু-একবার রাজেশ্বরীকে চুমু খেত। এসব লক্ষ্য করার কেউ ছিল না। অত সাবধান হওয়ারও তখন কিছু ছিল না।

সেই সময় রাজেশ্বরীর মুখ দেখে বোঝাই যেত, হেমন্ত তার পক্ষে আশার বস্তু। এইটে জানতে পেরে হেমন্তই সব ভণ্ডুল করে দিল একদিন। মাত্র দু'হপ্তার আলাপে ইরিগেশন ডিপার্টমেন্টের আনকোরা ইউ ডি হেমন্ত মিত্তির দুধের ডিপোর বাসবীকে কাগজের বিয়ে করে ফেলল। বিশেষ কিছুই জানত না বাসবীর কথা। মুখখানা গম্ভীর, মাথায় অনেক চুল, অল্প কথায় হেসে ফেলে—কেমন করে যে বাসবী এসব দিয়ে হেমন্তকে ভুলিয়েছিল তা এখন ভাববার বিষয় হতে পারে।

আচমকা বিয়ে করে ফেলে হেমন্ত কিছু অসুবিধায় পড়েছিল। রাজেশ্বরীকে জানানো হয় নি। এসব জানানো যায় না। বিশেষত যেখানে রাজেশ্বরী অতটা আশা করে বসেছিল।

ইরিগেশনের নতুন কাজে ঢুকতেই ঢল ঢল হাসিমুখ নিয়ে রাজেশ্বরী রোজ বিকেলে একেবারে ডিপার্টমেন্টে এসে হাজির হত। নতুন চাকরি। হেমন্ত কিছু অস্বস্তিতে পড়ত। আবার ভালোও লাগত তার। একটি মেয়ে তার ভাবী স্বামীর সঙ্গে রোজ অফিসে দেখা করতে আসছে। একসঙ্গে ছুটির পরে দু'জনে বেড়াতে বেরোচ্ছে। মন্দ কি! কিন্তু এই ব্যাপারটিই তাকে অসুবিধায় ফেলল।

আচমকা বাসবীকে বিয়ে করার পর রাজেশ্বরীর অফিসে আগমন হেমন্তকে রীতিমত ধাক্কা দিল। মুখে কি আশা! কি বিশ্বাসের হাসি! এক ঝাঁকুনিতে সব নষ্ট করে দিল হেমন্ত। ঘটনাটা ঘটেছিল এইরকম।

রাইটার্সে তেতলায় লিফ্‌টের মুখে রাজেশ্বরী দাঁড়িয়ে। বেলা পৌনে পাঁচটা। হেমন্ত পরিষ্কার বলল, তুমি আর এসো না। আমি গত বুধবারে বিয়ে করেছি।

প্রথমবার ঠিক বুঝে উঠতে পারে নি রাজেশ্বরী। সেই একই হাসি একই বিশ্বাস মুখে নিয়ে দাঁড়িয়েছিল। তাই হেমন্তকে আরেকবার বলতে হল। আমি বিয়ে করেছি রাজেশ্বরী। আমি আর তোমার সঙ্গে যাব না।

কি? এক প্রশ্নে রাজেশ্বরীর চোখের সামনে এতদিনকার পৃথিবী দুলে উঠল। খুব আশা করে খুব কাতরভাবে রাজেশ্বরী জানতে চাইল, বল তুমি মিথ্যে বলছ?

না রাজেশ্বরী। এই দেখ আমার হাতে বিয়ের আংটি। টেক ইজি!

ততক্ষণে রাজেশ্বরীর কপালে একটা শিরা ফুলে উঠেছে। উল্টো দিকে দাঁড়িয়ে সব বুঝতে পেরেছে হেমন্ত। না বোঝার নয়। রাজেশ্বরীকে সে আতিপাতি করে জানে। পেটের বাঁ দিকে একটা নীল রঙের জড়ুল আছে রাজেশ্বরীর—তাও জানে হেমন্ত।

রাজেশ্বরী অনেক কষ্টে নিজেকে দাঁড় করিয়ে রেখেছিল। তারপর নির্বাক হেমন্তর চোখের সামনে দিয়ে বিরাট কাঠের সিঁড়ি ধরে ধরে নিচে নেমে এসেছিল। কিছুতেই হতে পারে না। তখনো এই বিশ্বাস নিয়ে রাজেশ্বরী একটা ট্যাক্সি নিল। তারপর সোজা হেমন্তদের বাড়ি।

হেমন্তর বড়বৌদি রাজেশ্বরীকে চিনতেন। কতদিন এসেছে এ বাড়িতে। তাকে বসিয়ে বাসবীকে ডেকে দিয়েছিল। তোমার স্বামীর বান্ধবী এসেছে।

নতুন বৌ বাসবী কি কথা আর বলবে। সামনে যেতেই রাজেশ্বরী হাউ হাউ করে কেঁদে ফেলেছিল। বুঝতে পেরেছিল, কিছু আর করার নেই। তবু নিজেকে থামাতে পারছিল না রাজেশ্বরী। সে ভোলে কি করে। এই তো ক'দিন আগেও হেমন্তর হাত ধরে নৌকোয় উঠেছে। মাঝিদের আড়াল করে ছইয়ের ভেতরে হেমন্তকে যতটা পারে দিয়েছে। তখন কত আনন্দ ছিল। কত স্বপ্ন ছিল। হেমন্ত কি করে এমন কাজ করল। আমি তো কোন অন্যায় করি নি।

যাবার সময় বাসবীকে না বলে পারে নি। সামলে রাখবেন।

বাসবী কঠিন করে তাকিয়ে বলেছে, আমি কিছু জানি না। আমায় কিছু বলবেন না।

হেমন্ত আর কোনদিন কাঁসারিপাড়ায় যায় নি। একবার কাগজে দেখেছিল, প্রবীণ নাট্যামোদী আলিপুরের উকিল ভবানী রায়চৌধুরী পরলোকে। আহা! মানুষটি বড় ভাল ছিলেন। কোনদিন তার সামনে গিয়েও দাঁড়াবার সাহস হয় নি হেমন্ত মিত্তিরের। ততদিনে পর পর কয়েকটি ধাপ অফিসে পার হয়ে গেছে হেমন্ত। অভ্যেস অনেক বদলে গেছে। ঈষৎ মোটাও হয়েছে। ইনসিওরেন্স করেছে দুটো। বাসবীর জন্যে গ্যাস নিয়েছে বাড়িতে। বাসবীকে পাড়ার লাইব্রেরীর মেম্বার করে দিয়েছে গোঞ্জকলের সেই ছোকরা।

ধরা পড়ার ক'দিন আগে থেকেই আন্দাজ করেছিল হেমন্ত। একদিন নীহার গুপ্তের একখানা ডিটেকটিভ বইয়ের ভেতর একখানা চিঠি পেল। আরেকদিন বাসবী সেই ছোকরার সঙ্গে নর্দার্ন পার্ক থেকে রাত করে ফাংসান শুনে ফিরল। বেশি রাতে রিকশা এসে থেমেছিল তারই শোবার ঘরের জানলার পাশে। কি হাসি!—অত রাতে কত খুনসুটি! স্বামী হয়ে কার বা ভাল লাগে। যতই না কেন ছোকরা অত বাসবীদি বাসবীদি করুক।

সেন্ট্রাল মিনিস্টার একজন মারা গেল শুক্রবার। কলকাতার বাইরে বসিরহাটের দিকে খাল কাটা হবে। কন্ট্রাক্টরের জিপে চড়ে

অর্ধেক রাস্তা গিয়ে পথে একখানা কাগজ কিনে জানল, আজ সব কাজ বন্ধ। পতাকা হাফমাস্ট হয়ে গেছে রাইটার্সে এতক্ষণ। অতএব ফেরো। ফিরে চল। নিঃশব্দে বাড়ি ফিরে কাউকে পেল না হেমন্ত। সুশান্ত স্কুল থেকে ফেরে নি। স্কুল বাস সেকেণ্ড ট্রিপে পৌঁছে দিয়ে যাবে। তার বড় ভাইয়ের অফিস সেই জিঞ্জরাপোলে। সেখান থেকে বাসে ফিরতে ফিরতে তিনটে বাজবে। বৌদি বাড়ি নেই। শোবার ঘরের দরজাটা ভেজানো ছিল। আলগোছে খুলে ফেলতেই হেমন্ত থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। বাসবী আর সেই ছোকরা বিছানায়। বাসবীকে চুমু খেতে যাচ্ছে। বাসবী মুখ সরিয়ে নিচ্ছে। শেষে বাসবীও দিল। বরং যোগ দিল বলা যায়। অন্যের এমন ঘনিষ্ঠ দৃশ্য আর আগে এত কাছ থেকে হেমন্ত কোনদিন দেখে নি। যদিও দু'জনের একজন তার বিবাহিতা স্ত্রী।

ছেলেটিকে আর ছোকরা বলা যায় না। দেখছিল হেমন্ত—আর মনে মনে বলছিল, লোকটা কি! লোকটা কি! ততক্ষণে গেঞ্জিকলের লোকটি বাসবীকে পেড়ে ফেলেছে। বাসবীর দাপাদাপি, ওঠা-পড়া তাকেও ভেতরে ভেতরে ঝাঁকুনি দিচ্ছিল—আবার খুব কঠিন একটা কষ্ট গলায় এসে আটকে যাচ্ছিল হেমন্তর। ততক্ষণে বাসবীর সাদা উরু উল্টো দিকের ড্রেসিং টেবিলের আয়নায় বিপুল সাইজের দু'টি শাঁকালুর ছায়া মেলে হেমন্তর চোখে রক্ত এনে দিল।

নিজের অজান্তে হেমন্ত কখন দরজায় খিল দিয়েছে। তারপর নিজের মাথা ধরে ধপ করে বসে পড়েছে মেঝেয়। এ শব্দ কানে না যাওয়ার নয়। সদ্য তৃপ্ত বাসবী কোনরকমে উঠে দাঁড়াল। গায়ে জামা নেই। রাতে শোয়ার আগে এমন ঘনিষ্ঠভাবেই বাসবী রোজ কাছাকাছি এসে দাঁড়াত। আমি গত তিন চার বছর বাসুকে আরামেই রেখেছি। আমরা মে মাসে ফি'বার দার্জিলিং যাই। পুজোয় নৈনি। আমাকে পেছন থেকে আজকাল ডিপার্টমেন্টের লোকজন বলে—লাশ। আমি বিল চেক করি। ফলে আমার চেক করতে কণ্ট্রাক্টারদের পয়সা

আসে। আমাদের বসবার ঘরে কার্পেট, রান্নাঘরে গ্যাস, বাথরুমে বাথসল্ট, দেওয়াল-আলমারিতে এনসাইক্লোপিডিয়ার আনকোরা সেট—সুশান্ত যদি বড় হয়ে পড়ে! ফ্রিজে ইদানীং সফ্‌ট ড্রিঙ্ক থাকে। গাড়ি খুঁজছি কিছুকাল। আমি এসবই নিখুঁতভাবে করে যাচ্ছিলাম। আমাদের স্প্রিংয়ের জোড়াখাটে এখনো দু'খানা ভারি হাঁটুর ধামসানো দাগ। রেকর্ড প্লেয়ারের ওপর ছেঁড়া সুলতানের একটা থাপ।

কখন এলে?

আমি চোখ না খুলেই বললাম, দরজাটা খুলে দাও। লোকটা খাটের নিচে কষ্ট পাচ্ছে---

গেঞ্জিকলওয়ালা লোকটি এতক্ষণে উঠে এসেছে। নিজেই দরজা খুলল, এবং বেরিয়ে গেল। এসব ঘটতে তিন সেকেণ্ডও লাগে নি। আমার বুকের জোড়ের জায়গাটা এইমাত্র খুলে গেল। ভয়ঙ্কর যন্ত্রণা আগে কোনদিন পাই নি। এই প্রথম। জানলা দিয়ে পড়ে আসা দুপুরের আলো মেঝে অবধি এসে থেমে আছে।

বাসবী এগিয়ে গিয়ে দরজার খিল খুলে দিল। আমি পেছনটা দেখতে পাচ্ছি। কোমর আলগা দেওয়ায় নরম মাংসের ওপর সায়ার দাগ বসে যাওয়ার লোভনীয় চিহ্নটা আমায় এতটুকু নাড়াতে পারল না। একটা অতিকায় লোভী মাংসাশী বিড়ালের গন্ধ তুলে বাসবী আমার হাঁটুর ওপর এসে পড়ল। সব চুল আমার কোলে। ও ফুলে ফুলে কাঁদছিল। বিশ্বাস কর—এই প্রথম—আর কোনদিন হয় নি—আগে কোনদিন হয় নি—আমি তো মানুষ—

আমি সান্ত্বনা দিতে পারলে বেঁচে যেতাম। আশীর্বাদের ভঙ্গীতে ওর মাথায় হাত ছোঁয়াতে পারলে ভাল লাগত। তাও পারি নি।

সুশান্ত তখন দরজায় এসে ধাক্কা দিচ্ছিল। ছুটি হয়ে গেল মা। কে মারা গেছে—

বাসবী উঠতে পারল না। উঠলাম আমি। দরজা খুলে বেরিয়ে গেলাম। সেদিন কলকাতার কোন পরিবর্তন হল না। যেমন ছিল—

তেমনিই চলতে লাগল। রাত এগারোটায় রেডিও বলল, দিস ইজ ক্যালকাটা। হিয়ার ইজ দি ওয়েদার রিপোর্ট ভ্যালিড্ ফর নেক্সট্ টোয়েন্টিফোর আওয়ারস্—

সুশান্ত ঘুমিয়ে পড়েছিল। দাদা বৌদি ঘুমিয়ে। বাসবী লিটারালি আগেকার সতীদের মত আমার পায়ে মাথা খুঁড়তে লাগল। খুঁড়তে খুঁড়তে কপালখানা খাটের শক্ত আড়ায় গিয়ে ঠুকতে শুরু করে দিল।

আমি তখন বললাম, ওপরে উঠে এস।

বল, ক্ষমা করেছো।

সে-সব কথা পরে। আজ গা ধুয়েছো?

আমার কথার মানে ও এত সহজে ধরতে পারত। হাজার হোক ম্যারেড্ ওয়াইফ ইন ইটারনাল লাভলক! অ্যাটাচড্ বাথ্ থেকে ও তিন মিনিটের ভেতর চারদিকে সুবাস ছড়িয়ে বেরিয়ে এল। তুমি আজ যা বলবে আমি তাই করতে রাজি। ওর গা কি ঠাণ্ডা। আমার অনেকদিনের অনেকগুলো বেয়াড়া ইচ্ছে অপূর্ণ ছিল। ও কোনদিনই সেসবে বিশেষ সায় দিত না। আজ কিছুতেই বাধা দিল না। যেন ওরই উৎসাহ বেশি। একবার ঘন ক্ষীরের মত তৃপ্তিতে তলিয়ে যাওয়ার আগে পরিষ্কার বুনো গলায় বলল, গেঞ্জিকলের ওই কুচ্ছিৎ লোকটা তুমি থাকতে কোন্ ভরসায় আসতে সাহস পায় বল?

বাসবীর তখন কোন জবাবের দরকার ছিল না।

সেই অবস্থাতেই আমরা সেদিন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ছেলে বড় হচ্ছে। ঘুম ভাঙলো শেষ রাতে। কলকাতায় এই সময় দু'একটা পাখি আসে ভোরের দিকে। তাদেরই একটা আমাদের জানলায় এল। বাসবী জানে আমি ভোর ভোর লেবু-চা—পাতলা লিকারের খুব ভালবাসি।

আলুথালু অবস্থায় নিঃশব্দে সেই চা নিয়ে এল। আমরা দু'জনে এক সঙ্গে তারিয়ে তারিয়ে খেলাম। তারপর কাপটা ঠিক করে রেখে আস্তে বললাম, গেঞ্জিকলটা কদ্দূর এখান থেকে?

বাসবীর মুখখানা ভারি, শান্ত, প্রসন্ন ছিল। তার ভেতরেই চোখ জোড়া লাফিয়ে উঠল। আমি জানি না।

তোমাকে জানতে হবে। তোমাকে সেখানেই চলে যেতে হবে। এখুনি। এখনো সুশান্ত ওঠে নি। আমি রিকশা ডেকে আনছি। তোমার সব গয়না, শাড়ি—সঙ্গে নিয়ে যেতে পার। রেডি হয়ে নাও।

ভোরে কুয়াশা ছিল। আমাদের রিকশা হঠাৎ করে চেনা যাচ্ছিল না। গেঞ্জিকলের পয়সাওয়ালা স্বাস্থ্যবান অল্পবয়সী মালিকের চেহারা এবং ঘরদোর কেমন হয় আমি জানতাম। একটা আন্দাজ করেছিলাম। হুবহু মিলে গেল। একতলায় মিল। দোতলার সরু সিঁড়ি ধরে ওপরে উঠে তাজ্জব বনতে হয়।

লোকটা ভোরে ওঠে। দরজা খুলে আমাদের দেখে অবাক হল। রিকশাওয়ালা ছুটো বড় বড় স্টিলের ট্রাঙ্ক ওপরে তুলে দিল। খুচরো ছিল না। পয়সা দিল লোকটি। আমি তাকালাম না।

ভারি সোফা। নীল ডুম। রবিঠাকুরের ছবি ফ্রেমে বাঁধানো। ডানকোণের দেওয়াল গেঁথে সিন্দুক বসানো। ডবল বেডের খাটে গা-ঘিনঘিন-করা একটা ডবল বেডের চাদর। তাতে লাল নীল বরফি তোলা। দেখেই মনে হবে এ-ঘরে ডে অ্যাণ্ড নাইট রেপ হয়। মাস্টারবেশনের আদি আখড়া। সোডোমির ল্যাবরেটারি। সারা ঘরে পোড়া বিড়ির ছাই মাখানো। থুঃ! থুঃ! থুঃ!

হয়তো সেখানে সেসব কিছুই হয় না। কিন্তু ঘরের গন্ধ—লোকটির নীরেট মুখ—বাসবীর গলা দিয়ে চাপা স্বর বেরিয়ে এল—অবিনাশ—

আমি টুক করে বেরিয়ে পড়লাম।

নানাভাবে এসব কথা রসিয়ে রসিয়ে বলা যেত। কিন্তু সটে এর চেয়ে আর কি বলা যায়। ঠিক এরকমই হয়েছিল। বাসবীর চোখে তখনো ভোরবেলাকার ঘুম মাখানো। জানি না. সুশান্ত জেগে উঠে মা কোথায় জানতে চাইলে কি বলব। বৌদিকেই বা কি বলব তখনো তা ভাবি নি।

ভাগ্য ভাল। আমার সব ভাবনার ভার বাসবী একাই নিল। পাড়াসুদ্ধ সব জায়গায় অবিনাশের সঙ্গে এমন করে ঘুরতে লাগল, সুখের চেহারাটা এতবড় করে তুলে ধরতে গেল—যে আমাকে আর কোথাও জবাবদিহি করতে হল না।

শুধু সুশান্ত। সুশান্তকে আমি আজও কিছু বলতে পারি নি। বলার সময় হয় নি আসলে। হেমন্ত জানে, বাসবী আসে। বাসবী এ-বাড়িতে এসে কথা বলে। বৌদির সঙ্গে। সুশান্তর সঙ্গে, ভাশুর বলে দাদার সঙ্গেই হয়তো কথা হয় না কোন। নইলে তাও হত।

অথচ এই বাসবীর জন্যেই। মাত্র বারো-তেরো বছর আগে। সব অ্যারেঞ্জমেণ্ট কয়েক ঘণ্টায় পালটে দিয়েছিল হেমন্ত। নাহলে আজ অন্যরকম হত।

তাই রাজেশ্বরী বলে, আমিই কারণ!

ইণ্ডিয়ান মিউজিয়ামের দিকের গলিটা শেষদিকে আলো কম পেয়ে অন্ধকার হয়েছিল।

॥ তিন ॥

এমন জোলো, এমন রাবিশ, এমন ছেঁদো, এমন পয়েণ্টলেস লেখার কি মানে হয়? হেমন্তকে কেউ প্রশ্ন করলে হেমন্ত স্রেফ বলে দিত এইরকম। কে কোথায় কেমনভাবে ভাববে বলে জীবন তো গতি পাল্টাতে পারে না! তার মত একজন আনপ্রোডাকটিভ, ঘুষখোর, নীরোগ, আরামপ্রিয় বড় সাইজের বাঙালী কেরানী এর চেয়ে বেশি কি করতে পারত? থিয়োরির মাত্রায় তার জীবনযাপন যদি থাপ না খায় তবে সে কি করতে পারে।

একদিন সন্ধ্যের ঝোঁকে বাড়ি ফেরার মুখে ওদের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। অবিনাশ আর বাসবী রিকশায়। অবিনাশের হাতে অনেক ফুল। সে মাথা ঝুঁকিয়ে রিকশা থেকেই হেমন্তকে উইস করল। হেমন্ত সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে বাসবীর দিকে তাকিয়ে থাকল। বাসবী প্রাণহীন কোন দেওয়াল দেখছে—এইভাবে হেমন্ত সুদ্ধ রাস্তাটুকু রিকসার টুং টুং ঘন্টির সঙ্গে দুলতে দুলতে পার হয়ে গেল।

পকেটে টাকা ছিল। বাড়ি ফেরা হল না। দেশ গড়ার কাজে সরকার নানান জায়গায় খাল কাটাচ্ছে। ফলে পয়সা আসছিল অঢেল। কথার কিছু নেই। হেমন্ত ট্যাকসিতে উঠে কলেজ স্ট্রীটের পাড়ায় চলল। যদি বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে দেখা হয়। কফি হাউস, বিদ্যাসাগরের স্ট্যাচুর চারপাশ—কোথাও কাউকে পেল না। সেসব জায়গায় নতুন নতুন ছেলেরা বসে। আমাদের ক্লাসফ্রেণ্ডরা কোথায় গেল? দোকানদারগুলো পাল্টায় নি। পান সিগারেটের দোকান কিছু বেড়েছে। রাত আটটা নাগাদ হেমন্ত পরিষ্কার বুঝলো—তার জন্যে কোথাও কেউ ওয়েট করে নেই।

ফাঁকা ট্রামে শ্যামবাজারের দিকে রওনা দিল।

জায়গাটা চেনা ছিল। আগে কোনদিন ভেতরে যায় নি। আজ গেল। কলকাতা শহরের বুকে আজও যে ছায়া ছড়ানো কদম গাছের নিচে উঠোনের গা ধরে ঘর থাকে—তাতে রাস্তার ইলেকট্রিকের পাশাপাশি হারিকেন ঝোলানো অবস্থা আলোয় নড়বড়ে চৌকির ওপর খানিকক্ষণের জন্যে মেয়েলোকের সঙ্গে শোয়া যায়—ভেতরে না ঢুকলে কোনদিন হেমন্ত তা জানতে পেত না।

ভাল করে মুখ দেখা যায় না। বত্রিশ হতে পারে। তেতাল্লিশ হতে পারে। তাতে কিছু যাচ্ছিল আসছিল না। মেয়েলোকটি একটা ভুল করল। তারও দোষ নেই বিশেষ। অন্ধকারে হেমন্তকে ভাল করে দেখতে পায় নি। যেমন করে থাকে, ঠিক সেইভাবে হেমন্তকেও তাড়াতাড়ি গরম করে দিতে গেল। খসখসে গলায় বলল, বটতলা থানার ওসি ছেলে করে দিয়ে জীবনটাই গন্ধ করে দিল।

ছেলে ?

এই তো এখন দেড় বছর বয়স। কদমতলায় শুয়ে আছে.

ছ্যাকোনি ?

খোলা দরজা দিয়ে তাকাতে ইচ্ছা করল না হেমন্তর। কাৎ হয়ে শুতে যাচ্ছিল। মেয়েলোকটি ঝাঁঝিয়ে উঠলো। তাতে একটু আবদার মেশানো। খিদে পাচ্ছে কেন বল তো ?

হেমন্ত কথা না বাড়িয়ে পকেটে হাত ঢুকিয়ে বের করে দেখল তিনখানা দশ টাকার নোট উঠেছে।

খপ করে নিজের হাতে নিয়ে মেয়েলোকটি খাট থেকে নামল। আমায় বাসন্তী বলে ডাকবে কিন্তু। তারপর দরজার কাছে গিয়ে চাপা গলায় কাকে ডাকল। অন্ধকারে আর একটা অন্ধকার উঠে এল। বোঝা যাচ্ছিল লোকটা এই অন্ধকারেই কোথাও ঘাপটি মেরে পড়ে থাকে সব সময়। কে অন্ধকারে হামানদিস্তায় অনন্তকাল ধরে কি পিষে চলেছে। তারই একঘেয়ে শব্দ। তার সঙ্গে হিঙের গন্ধ বাতাসে ভাসছে। হারমোনিয়ামে কাদেরই ঘরে চালু গানের গৎ

ফিরে ফিরে বাজছিল। সঙ্গে বেতালা ঘুঙুর। তেলেভাজার ছ্যাঁক ছ্যাঁক।

এরকম অবস্থায় পর পর সাজিয়ে কিছুই ভাবা যায় না। খাবার এল। গুচ্ছের ঝাল দিয়ে রান্না কষা মাংস, পরটা আর জল মেশানো রাম—যা খেলেই মাথা ধরবে নির্ঘাত। মেয়েটা খেলো খুব। চুষে চুষে। চক চক করে। চিবিয়ে চিবিয়ে। অন্ধকার মেঝেতে হাড়ের টুকরো ফেলছিল। এতক্ষণে হেমন্ত বয়স বুঝতে পেরেছে। বছর চৌত্রিশ তো বটেই।

প্লেটগুলো হেমন্তই ঘরের কোণে সরিয়ে রাখল। নিজের রুমালে মুখ মুছে মেয়েটিকে এগিয়ে দিল।

কাল ভোরে কেচে দোব'খন—

রেখে দাও তোমার কাছে। আমার লাগবে না।

সত্যি। দিয়ে দিলে? রুমালটা মেলে ধরে জমি পরীক্ষা করে বলল, নাগো নিয়ে যাও। রোমাল দিয়ে ভাব করলে শেষে কেটে যায়।

ততক্ষণে নেশা ধরেছে মেয়েটার। হেমন্তর নিজেরও খুব পাতলা একটা ভাব এসে যাচ্ছিল। আসল নাম না নকল নাম কে জানে? বাসন্তী হেমন্তর উরুর ওপর ডান পাখানা ছড়িয়ে দিল। প্লেট একেবারে মুছে খেয়েছে। একবার উঠে গিয়ে ঘরের কোণে একটা বড় নালীর মুখে একটু বসেই উঠে এল। খাটে বসবার আগে তাক থেকে আনকোরা ক্যাপ নামিয়ে দিয়ে বলল, ডেড়টা টাকা কিন্তু দিতে হবে। দু'টো নিলে আড়াই টাকা। তারপর হেমন্তর বুকে নাকমুখ ঘষে বলল, হ্যাঁগো—রাতটা থাকবে তো? সে-ই বুঝে দোর আটকে দি।

যেমন বলবে তুমি।

বলি কি থেকে যাও! বেশি রাতে বেরিয়ে তো গাড়ি ঘোড়া পাবে না। পঁচিশের ওপর আর দশটা টাকা ধরে দিও। কেমন! তোমার নামটা বললে নাতো—

যাবার সময় বলে যাব।

কাছাকাছি সব ঘরে ঘরে লোক বসেছে। বিশেষ করে রাম—তাও আবার জল মেশানো—অত তাড়াতাড়ি খেয়ে একটু মুশকিল করল বাসন্তী! কিকটা খুব কুইক হয়ে গেল। হেমন্তর ততটা নয়। চাদরের নিচে তোষক ঠিক মিল খায় নি। যেখানেই বসে—যেখানেই শোয়—গায়ে লাগে হেমন্তর। বাসন্তীকে চুমু খাওয়ার প্রবৃত্তি হল না। আর বাকি যা যা চলতে লাগল। বাইরে কত রাত বোঝার উপায় নেই। হাতঘড়িটা তাকে। কাছাকাছি কোন ঘরে হামানদিস্তায় কি যেন পিষেই চলেছে কে। ঠিক এই সময়ে বাসন্তীকে আর বাগে রাখা যাচ্ছিল না। পরিষ্কার বলল, একটা গান দাও।

প্রথমবার বুঝতে পারে নি হেমন্ত!

বাসন্তী ফিরে বলল, একটা গান দাও।

কি?

একটা গান দাও না গো। বেশ সুর করে গাই।

হেমন্তর ভেতরটা ধক করে উঠল। গান চাওয়া যায়? গান দেওয়া যায় তাহলে? পেলে লোকে সুর করে গাইতে পারে। আশ্চর্য তো! কিন্তু এখুনি তো কোন গান আসছে না মনে। বাসন্তীকে বাগ মানায় কি করে। বেশ নেশা হয়েছে: তবে গলা পরিষ্কার করেই কথা বলছে এখনো। দাও না। অ্যাতো করে চাইছি। দেবে না—বলতে বলতে নিজেই গেয়ে উঠল। কথা ধরা যাচ্ছিল না। সুরটা রবীন্দ্রসংগীতের মতই। অনেকটা—এই করেছ ভালোর মত। বাসন্তী ধরেছিল এরকম—অ্যাই করেছো বালো—

তবু খারাপ লাগল না। আচমকা গান থামিয়ে বলল, দাও না একখানা গান। বেশ বুক ভরে গাই। তুমি কত আদর করে খাওয়ালে। প্লেট তুলে রেখে দিলে—এইখানে থেমে বাসন্তী ঝুঁকে পড়ে হেমন্তর গালে একটা মস্ত চুমু দিল। শব্দ হল। খানিক আগে

হলেও হেমন্ত সঙ্গে সঙ্গে রুমাল দিয়ে মুছে ফেলত জায়গাটা। এখন এমনি গালেই শুকোতে দিল।

খানিক পরে বাসন্তীর ঠাণ্ডা গাতুড় পাছায় হাত রেখে হেমন্ত ঘুমিয়ে পড়ল। তার আগেই অবশ্য বাসন্তীর নাক ডাকছিল। ধুতির ভাঁজ নষ্ট হবে বলে তুলে রেখেছিল আগেই। নেশা ধরতে পাঞ্জাবিটা আর খোলা হয় নি হেমন্তর। কাঁধে ব্যাগ ঝোলালে এখন দিব্যি প্রাইভেট বাসের কণ্ডাক্টর লাগত ওকে। ঘুমন্ত কণ্ডাক্টর।

শেষরাতে ঘুম ভাঙালো পুলিশ। গোলমাল। দু'জন পাজামা পরা ছোকরা পালাতে গিয়ে ছুটোছুটি করে ধরা পড়ল। কান্নাকাটি। জনা যোল মেয়ে। তার কিছু বেশি পুরুষ। দুটো বুড়ি। দুটো ঘুমন্ত বাচ্চা। শেষ রাতে রাস্তার আলোর ভেতরে চালান হয়ে গেল। ধুতি পরবার সময় দেয় নি বিশেষ। কাছা দেবার সময় হেমন্তর পিঠে পুলিশ একটা ভাল থাপ্পড় দিল। কাঁচা ঘুমে জেগে উঠে এমন মারধোর কোনদিন খায় নি।

পরদিন বেলা দশটায় ব্যাংকশাল কোর্টে ওদের তোলা হলে কোর্ট ইন্সপেক্টরের জবানীতে জানল, এ কাজের জন্যে জায়গাটার না কি কোন লাইসেন্স নেই। লোক গিজগিজ করছে। তার ভেতরে রাত জাগা চোখে বাচ্চা, বুড়ি, মাগী পুরুষ মিলিয়ে প্রায় চল্লিশটি প্রাণী—বেঞ্চে বেমালুম বসে আছে। তার ভেতরে হেমন্তও একজন। বাসন্তী কোর্ট ইন্সপেক্টারকে কাছাকাছি দেখলেই চেঁচাচ্ছে—কি হল প্রমথবাবু! ও প্রমথবাবু।

কোর্ট ইন্সপেক্টারও দূরে দূরে থাকছিল। পারতপক্ষে বাসন্তীর দিকে তাকাতেই চাইছিল না। বাসন্তীও নাছোড়বান্দা। কাছাকাছি এলেই ডাকবে। বাঁগালে কাল রাতের কষা মাংসের হলুদ দাগ। জজ মত একটা লোক ধড়াচুড়ো পরে ঠিক পাখার নিচে একটা উঁচু চেয়ারে বসে। প্যায়দা ঘুরছে। পেশকার লিখছে। দেওয়াল-ঘড়ির পেণ্ডুলাম দুলছে। আধখানা ডিম উলটে বসানো ছাদ। গঙ্গার

দিক থেকে একটা চামচিকে উড়ে এসে এই গম্ভীর এজলাসে দিব্যি মহাফুর্তিতে পাক খাচ্ছিল।

বাসন্তীদের এখানে যে আরও কয়েকবার আসতে হয়েছে তা দেখেই বোঝা যায়। বাসন্তীর পাশের মেয়েটা সিগারেট ধরিয়ে সুখটান দিল—তারপর একরাশ ধোঁয়া উড়িয়ে আদালতেরই একজন কর্মচারীকে বলল, একগ্লাস জল দে।

সঙ্গে সঙ্গে জল এসে গেল। ঠিক তখনই বাসন্তী হেমন্তর দিকে তাকিয়ে বলল, এখনো টাকা দাও নি কিন্তু।

হেমন্ত শুনলো, একটা গান দিলে না তো! তখুনি দেওয়াল-ঘড়িতে এক এক করে বারোটা বাজলো। ঘড়ি থামলে হেমন্ত বলল, দেব। দেব। এখান থেকে বেরিয়েই দেব। জামিনটা হোক আগে—

বাসন্তী বলল, আর কখোন দেবে? জামিনের পর তো তোমার আর টিকিটি পাব না। এই বেলা টাকা ফেল বলচি।

এবার ঠিক শুনতে পেল হেমন্ত। সঙ্গে সঙ্গে চারখানা দশটাকার নোট এগিয়ে দিল। ভাঙানি নেই। গোনা নেই। আন্দাজে পাকিয়ে বাকিটা আণ্ডারঅয়ারের দড়ির ঘরে গুঁজে দিয়ে বসল। পাঁচটা টাকা বেশি যাওয়াতে এই দিনের বেলা মনটা খচ-খচ করে উঠল।

সবার আগে জামিন হয়ে হেমন্ত আর কোন দিকে তাকালো না। কাল বিকেলে বাড়ি ফেরে নি। বৌদি, সুশান্ত, দাদা এতক্ষণে পাড়া তোলপাড় করে বেড়াচ্ছে। দোতলার সিঁড়ির মুখে এসে দেখল, বড় সরকারী জানলা দিয়ে লালদীঘি একেবারে একখানা ছবি হয়ে পড়ে আছে। মোটর, বাস, ট্যাক্সি, ট্রাম—মোড় ঘুরছে যেন দম লাগানো পুতুলের দশা।

পাশ দিয়ে খুব সুন্দরী একজন নেমে যাচ্ছিল। সঙ্গে উকিল। তার কালো কোটের পকেটে সাদা নথি। পাশে চাপরাশী। একতলায় নেমে মেয়েটি মোড় ঘুরতেই হেমন্ত চেঁচিয়ে উঠল, রাজেশ্বরী—

একখানা উদ্ধত মুখ ঘুরে তাকালো। আলুথালু, রাতজাগা হেমন্তকে আদৌ চিনতে পারল না। হেমন্ত ছুটে নেমে এল, এখানে কি করছিলে? আমি হেমন্ত—

উকিল থেমেছে। চাপরাশী থেমেছে। বড় সরকারী দরজা খোলা পেয়ে পথের হাওয়া ঢুকে পড়ে রাজেশ্বরীর আঁচল অনেকটা উড়িয়ে নিল। আঁচল সামলে রাজেশ্বরী তাকাল, তুমি?

হেমন্ত অবাক। মুখে বলতে পারল না—তুমি এত সুন্দরী হয়ে গেলে কবে? আবার বললেও মুশকিল। তার মানে কি কোনদিন সুন্দরী ছিল না। তাতো বলা যায় না। বিশেষ করে এতদিন পরে —প্রথম আলাপে। দ্বিতীয় আলাপেও নিশ্চয় নয়। কোন আলাপেই কোনদিন বলা যায় না।

এখানে কি করছ হেমন্ত?

আর বোলো না। গভর্নমেণ্টের হয়ে কেস দেখাশুনো করতে আসছি ক'দিন। সিম্পিল ডিফালকেশন—কিন্তু ক'দিন যে আসতে হবে বুঝতে পারছি না।

উকিল, চাপরাশী চোখের ইশারায় কাটিয়ে দিল রাজেশ্বরী। কোন দিকে যাবে?

ডালহৌসির ফুটপাথে নেমে ঠিক তখুনি কিছু বলতে পারল না হেমন্ত। বাতাসে রাজেশ্বরীর ফরসা পা অনেকখানি বের করে দিচ্ছিল কালো ঝালর লাগানো সায়া উড়িয়ে দিয়ে। বড় চোখে মানানসই রোদ-চশমা পরে নিয়েছে রাজেশ্বরী। অফিসযাত্রীরা ঘুরে দেখতে দেখতে এগিয়ে যাচ্ছে। একদিকে রাজভবনের গা দিয়ে ময়দানের পথ। অন্যদিকে রাইটার্সের পাশ দিয়ে নেতাজী সুভাষ রোডের মাথা দেখা যাচ্ছিল।

চল কোথাও বসি। তাড়া আছে?

কিছু না। এই ট্যাক্সি—দাঁড় করিয়ে নিজেই আগে ভেতরে ঢুকে বসল। তারপর সরে হেমন্তকে বসতে দিল। পার্ক স্ট্রীট—

ট্যাক্সিওয়ালাকে বলে এবার রাজেশ্বরী পুরোপুরি হেমন্তর দিকে তাকাল। হেমন্ত সে মুখে সোজা তাকাতে পারছিল না। ঝকঝকে তকতকে। দুই ভ্রূর ভেতর দিয়ে চোখ ছোট করে রাজেশ্বরী তাকাল আবার। হেমন্ত হাসল। এর বেশি কিছু করতে পারল না।

এ যে একেবারে অন্য রাজেশ্বরী। গা দিয়ে ফুরফুরে গন্ধ বেরোচ্ছিল। সুতোর কাজ করা ব্লাউজের হাতার বাইরে দু'খানা নিটোল হাত। শাড়ির পাড়ে জরি। বুকের ওপর হারের লকেটটা কামড়ে বসেছে। এ রাজেশ্বরীর শরীরে কোথাও অপুষ্টির চিহ্নমাত্র নেই। দিব্যি ঝরঝরে তকতকে। এইমাত্র রাজেশ্বরী যেন ষোল ঘণ্টা একটানা ঘুম দিয়ে উঠেছে। অথচ আসলে ব্যাংকশাল কোর্ট থেকে বেরিয়ে এল। দিব্যি গট গট করে করিডরে হাঁটছিল। সঙ্গে তটস্থ উকিল। ইংগিতে উধাও চাপরাশী।

ফট করে মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল হেমন্তর : তুমি কি ব্যারিস্টার হয়েছো না কি ?

কেন বল তো ?

দাঁতগুলো ঝকঝকে। নখে ফিকে গোলাপির পালিশ। কানে হীরের কুচি বসানো সোনার দুল। হাতখানা শাড়িতে ঢাকা উরুর ওপরে রেখেছে—তাতে কালো ডায়ালের একটা ঘড়ি লটকানো।

কোর্টের বারান্দায় এমন হাঁটছিলে—সবাই তোমার পেছন পেছন —যেন তোমারই ঘরবাড়ি।

ওঃ! পয়সা দিলে উকিলরা ওরকম ঘোরে—

ঠিক দুপুরবেলা। লাঞ্চের ভিড়টা সবে কেটেছে। ঠাণ্ডা ঘরে মৃদু আলোয় পার্ক স্ট্রীটের চালু রেস্তোরাঁয় দু'জনে প্রায় বারো-তেরো বছর পরে মুখোমুখি বসল। বাসবীর সঙ্গে বিয়ের পর রাজেশ্বরীর সঙ্গে হেমন্তর লাস্ট দেখা হয়েছিল—বরং বলা ভাল, ছাড়াছাড়ি হয়েছিল রাইটার্সের তেতলায়—লিফ্‌টের মুখে—রাজেশ্বরী বড় কাঠের সিঁড়ি বেয়ে নেমে যাচ্ছিল। এ রাজেশ্বরী সে রাজেশ্বরী নয়। এখন ওকে

রাজেন্দ্রাণী বলা যায়। মৃদু আলোয় আরও মনোহারী লাগছিল। ট্যাক্সি থেকে নেমে এমন ক্যাজুয়ালি সুইংডোর ঠেলে রেস্তোরাঁয় ঢুকলো, ওয়েটাররা কেউ কেউ নড্ করল, টেবিলে টেবিলে দু'চার জন যারা ছিল—তারা এমন নড়েচড়ে বসল—যেন হেমন্ত জ্যাকপট পেয়ে এইমাত্র এক নম্বর ঘোড়ার লাগাম ধরে স্টেজে এসে দাঁড়িয়েছে। এ কি স্বপ্ন? না সত্যি? এ জায়গাগুলো এমন সহজ করে ফেলল কি করে কাঁসারিপাড়ার ভবানীবাবুর মেয়ে।

কি খাবে?

খিদে পেয়েছিল। কিন্তু হেমন্ত টক করে কিছু বলতে পারল না। কোন রিস্ক নিল না। পাছে হেমন্ত আনাড়ী বলে প্রভড্ হয়—তাই বলল, তুমি যা নেবে—

ওয়েটার দাঁড়িয়েই ছিল। খুব আবছা গলায় কি বলল। শেষ কথাটা শোনা গেল। দু' প্লেট সিজলিং চিকেন।

এই মেয়ে হেমন্তর সঙ্গে ভবানীপুরের কাঠের পার্টিশন দেওয়া 'লেডিজ' লেখা রেস্তোরাঁর ঘরে বসতে চাইত না। পর্দা ফেলতে দিত না। কে বলবে আজ! বললে কে বিশ্বাস করবে?

বাবা কেমন আছেন?

তিনি তো এখানে নেই। পুরনো কথা থাক হেমন্ত।

দেশের বাড়িতে গেছেন?

হ্যাঁ। দু'বছর হল স্বর্গে—এখানে খুব একচোট হেসে ফেলল রাজেশ্বরী। অবশ্য সেই নামে যদি আসলে কোন জায়গা আদৌ থেকে থাকে! কি বল! তারপর তোমার খবর কি?

ভাল আছি।

ছেলেমেয়ে ক'টি হল?

একটি। ছেলে।—তোমার?

অনেক! বোকার মত কথা বলছ কেন? দেখে মনে হয় আমি বিয়ে করেছি?

না। অনেকে তো বিয়ে করেও সিঁদুর পরে না। শাঁখা রাখে না—

কি বুদ্ধি! বিয়ে করলে ওসব চিহ্ন রাখতে যাব না কোন্ দুঃখে বলতে পার! তোমার বউ বুঝি তাই করে?

আমার বউ নেই।

রাজেশ্বরী গম্ভীর হয়ে গেল। সরি। কি হয়েছিল তাঁর—

কিছুই হয় নি।

তার মানে? এই যে বললে—

হ্যাঁ। এমনি—

ওঃ! তাই বল! পালিয়েছে—

না রাজেশ্বরী। আমিই তাড়িয়ে দিয়েছি।

তাই বল রমাচন্দ্র! এখন বিহনে কাটাচ্ছ বল! তা দেখে তো বেশ সতী সাবিত্রী লেগেছিল। কি দোষে তাঁকে এমন শাস্তি দিতে গেলে হেমন্ত—

যতই শুনছিল ততই অবাক হচ্ছিল হেমন্ত। এ কোন্ রাজেশ্বরী কথা বলছে? সেই শান্ত, নিশ্চুপ, একাগ্র মেয়েটি কোথায় গেল। তার চিহ্নমাত্র এখনকার রাজেশ্বরীর ভেতরে নেই। এখন কেমন চটপটে, সুরসিক, ভীষণ লোভনীয়ও বটে। মাত্র বারো-তেরো বছরে কত কি বদলে গেল।

তাহলে হাত পুড়িয়ে রেঁধে খেতে হচ্ছে?

বড় বৌদির সঙ্গে থাকি।

ছেলে হসটেলে?

না। বাড়ি থেকেই যাতায়াত করে।

মায়ের জন্য কাঁদে-কাটে না?

বড় হচ্ছে। সিক্সে পড়ে।

তাহলে তো আরও কাঁদবে।

কাঁদে কি না জানি না। তবে মাঝে মাঝে নিয়ে আসতে বলে।

নিয়ে এসো। কি যেন আরও বলত রাজেশ্বরী। ওয়েটার এসে

গেল। সিজ্‌লিং চিকেন বস্তুটিতে বেশ গ্র্যাঞ্জার আছে। কালো পাথরের প্লেটে লাল করে কষানো মুরগির ঠ্যাং। তাতে চামচ ঠেসে ধরতেই ঝাঁ ঝাঁ আওয়াজ—ধোঁয়া। কাগজের ঘেরটোপ পরানো রঙীন ডুম মাথার ডানদিকে বাঁদিকে ঝুলছে। জিউক বক্সে চাপা ভলুমে হিন্দি ছবির হিট সং। রাজেশ্বরীর বসবার ঢং, কাঁটা চামচ নাড়বার ভঙ্গী নায়িকা নায়িকা।

নিজের জন্য জিন অ্যাণ্ড লাইম বলে রাজেশ্বরী হেমন্তর দিকে তাকাল। তুমি কি নেবে?

আমার তো বিশেষ অভ্যেস নেই। বিয়ার বল।

একটা এল। তারপর আরেকটা। হেমন্ত এতক্ষণে চাঙ্গা হল। রাজেশ্বরীর জন্যেও দু'বার এল। ওরা বাইরে বেরিয়ে এসে দেখল, কলকাতার পথেঘাটে স্রেফ ওদেরই জন্যে মোলায়েম রোদ উঠেছে। বিকেল আসতে বাকি। এরই ভেতর হোটেলের ঠাণ্ডা গাড়ি-বারান্দায় ফুলওয়ালারা এসে গেছে। রঙীন ম্যাগাজিনের দোকান। রেকর্ডের দোকানের শো উইণ্ডোতে রাজেশ শর্মিলার ঘনিষ্ঠ পোস্টার। অন্ধ, স্বাস্থ্যবান ভিখারি—আল্লা রহিম করে—বলে নারকেল মালা এগিয়ে ধরল। রাজেশ্বরী তাতে একটা কাঁচা টাকা ফেলে দিয়ে বলল, আজ তোমার সঙ্গে কতদিন পরে দেখা।

চল গঙ্গার ঘাটে যাবে?

রাজেশ্বরী হেসে বলল, আমি আগেকার জায়গায় যেতে পারব না কিন্তু।

দোষ কি। কতদিন সেসব জায়গায় যাই নি।

কেন? বউকে নিয়ে যাও নি?

দু'জনে এখন ট্যাকসিতে। ক্যাসুরিনা অ্যাভেন্যু দিয়ে নতুন মার্ক টু পোষা কুকুরের মত ছুটে যাচ্ছিল।

দু'একবার গেছি। বাসবীর কথা ভাল লাগছে না।

সেই ভাসন্ত রেস্তোরাঁ আর নেই। একতলায় জেটিটা আছে।

তার রেলিংয়ে এখন আগের চেয়ে অনেক বেশি জং ধরেছে। বারো বছর আগের নৌকোগুলো আজও ঘাটে বাঁধা। এখনকার মাঝি-মাল্লারাও বোধহয় তারাই। কেউ বুড়ো, কেউ যুবক হয়েছে এতদিনে।

তুমি এই রেলিংটা ধরে গান গেয়েছিলে রাজেশ্বরী।

তোমার মনে আছে!

আমি কিছু ভুলি না। সব মনে থাকে।

আমি সব ভুলে যাই হেমন্ত। সব। বিশেষ করে তুমি এমন করে ভুলতে শেখালে—

তুমি গেয়েছিলে—আমার পথের থেকে তোমার পথ গেছে বেঁকে গেছে বেঁকে—ধ্যাৎ ছাই! রবীন্দ্রসঙ্গীতের লাইন আমার গুলিয়ে যায়। গাও না গানটা। গাইবে? এখন কাছাকাছি কেউ নেই—

ওসব গান আমি ভুলে গেছি হেমন্ত। আমি গাই না।

আমি তো বেশি বুঝি না। তুমি এখন যা গাইবে তাই ভাল লাগবে আমার। দাও না একটা গান। একটা গান দাও রাজেশ্বরী —সুর করে মনে মনে বুক ভরে গাই। দাও না—

রাজেশ্বরী খট করে ঘুরে তাকাল। মনে হল ওর ঘাড়ের কাছে আওয়াজ হল এইমাত্র। চোখের কোলে দু' ফোঁটা জল যে কোন সময় এখন জমে উঠতে পারে। তারপর কি বলল, কিছুই শুনতে পেল না হেমন্ত। কারণ, মাঝগঙ্গায় একটা গাধাবোট থেকে ভীষণ শব্দ করে লোহার মোটা শিকল জলের মধ্যে নেমে যাচ্ছিল। লাগোয়া স্টিমারটা এক জায়গায় দাঁড়িয়ে ভোঁ বাজিয়ে কিসের সিগন্যাল দিচ্ছে। কাছাকাছি একটা লঞ্চ মোড় নিয়ে ওপারে রওনা দিল। তার লেজে কাটা ফেনার মাথায় মাথায় সাদা বকের দল গেয়ে উড়ছে। এসব দৃশ্য যে কোন দর্শকের অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ একাকার করে দেবেই।

দু'জনে চুপ করে এক মন দিয়ে সবকিছু দেখতে লাগল, শুনতে লাগল। একখানা বিরাট মেঘ নদীর বুকে ঘোলা জলের ওপর

আধখানা জুড়ে ছায়া ফেলে আরও কালো করে দিল। হেমন্তর শুকনো এলোমেলো চুলে বাতাস যাতায়াত করছে। পুরন্ত দু'খানা কাঁধের ওপর দিয়ে সেই বাতাস নেমে গিয়ে জলে পড়ছিল। রাজেশ্বরীর শাড়ির ভারি পাড় একই বাতাসে দুলছে। মাথার চুল কয়েকবারই এলোমেলো হয়ে গেল।

ওরা তখনো মাঝনদীতে গাধাবোট থেকে শিকল নামানো দেখছিল। শুনছিল। এই ছবির একটা আলাদা গন্ধ ছিল। সে-গন্ধ বারবার গতজন্মের ভুলে যাওয়া পথ ঘাট, বাড়ি-ঘরের কথা মনে করিয়ে দেয়। মনে হয়, আর যেন কে ছিল। যেন কে ছিল সঙ্গে। যাকে কোনদিনই আর মনে করে ফিরে পাওয়া যাবে না।

এদিককার পাড়ে নদীর গা ধরে গম্ভীর চালে অশ্বত্থ উঠেছে। জল হাওয়া বাতাস পেয়ে তাতে নানা জায়গা দিয়ে নতুন কচি পাতা বেরোচ্ছে। তাদের কি লুটোপুটি।

আচ্ছা রাজেশ্বরী। আমরা কি কোনদিন অর্ডিনারি ছিলাম?

কক্ষনো না। কোনদিন না।

কিন্তু যে অর্ডিনারি হয়ে গেলাম। হয়ে গেছি।

কবে? কি করে হেমন্ত?

আমরা যে কেউ টের পাই নি। অনেকদিন হল—

॥ চার ॥

পাড়ায় খুব ধুমধাম করে সরস্বতী পুজো লাগাল অবিনাশ। বিদ্যেধর স্বয়ং অবিনাশ। গেঞ্জিকলওয়ালার সঙ্গে বিদ্যেধরী বাসবী। পাড়ার মধ্যবয়সীরা অন্তত তাই বলাবলি করল। অবিনাশের আসল প্ল্যানটা বুঝতে পারল হেমন্ত। ভাগানো পরের বউকে নিয়ে ঘর করতে গেলে পাড়ার মস্তানদের সাপোর্ট চাই। তা পেতে গেলে সরস্বতী পুজো, থিয়েটার ইত্যাদি মোক্ষম রাস্তা। সেই পথই ধরেছে অবিনাশ। প্রায় দুর্গাপুজোর ধুমধাম দিয়ে সরস্বতী'র জো হয়ে গেল। পাড়ার ছেলেদের মুখে বাসু বৌদির নাম নিয়ে সুখ্যাতির ছড়াছড়ি। তাঁর হাতের চা নাকি কাতুর দোকানের ডবল হাফকেও হার মানায়। আগেও ছেলেরা বাসু বৌদি বলেই ডাকত। যেমন অবিনাশও ডাকত। শেষদিকে বাসবীদি বাসবীদি করেছে ক'দিন। মাঝখান থেকে বৌদির দাদাটি পালটে যাওয়ার ব্যাপার নিয়ে পাড়ার ছেলেরা মাথা ঘামানোর কোন চান্সই পেল না। কেন না, অবিনাশ তাদের সবরকমে ব্যস্ত রেখেছিল। উপরন্তু এইভাবে নিজের নতুন স্ট্যাটাসের একটা আধা-স্বীকৃতিও আদায় করে ফেলল অবিনাশ।

এত বড় পুজোয় সুশান্তকে হেমন্ত একবারও প্যাণ্ডেলে যেতে দেয় নি। পাড়ার একফালি পার্কের পথটা মাসখানেক আদৌ মাড়ায় নি। পাড়াটা ছাড়া দরকার। কিন্তু এই ভাড়ায় এমন ফ্ল্যাট এখন কোথায় পাবে।

দু'দিন অফিসের পর হেমন্ত সুশান্তকে নিয়ে বেরোলো। বাবা হিসেবে কম্পানি দেওয়া দরকার। নিজে বোঝে কিন্তু দেওয়া হয় না। সময়ই হয় না, একটা না একটা কাজে আটকে যায়।

সুশান্ত আর হেমন্ত পথে বেরিয়ে দেখল, যাওয়ার কোন জায়গা

নেই। সুশান্ত তো বলেই ফেলল, বাবা কলকাতায় লোকে শুধু চাকরি করে ?

কি জবাব দেবে হেমন্ত ! প্রথম দিন সন্ধ্যেবেলা রবীন্দ্রসদনে নিয়ে রবীন্দ্রনাথের বর্ষার গান শুনতে গেল। সুচিত্রা মিত্রের 'নীলনবঘনে…' রেলিশ করতে সুশান্তর কোন কষ্ট হল না। মুশকিল বাধালো অশোকতরু। তাঁর গানের সঙ্গে স্টেজের ওপর একটি মেয়ে আর একটি ছেলে ধুপধাপ নাচছিল।

সুশান্ত একসময় বলল, বাবা ও ওরকম করছে কেন ?

হেমন্ত দেখল, সত্যিই তো অশোকতরু ভেন্ট্রিলোকুইলিস্টদের মত গলা দিয়ে নানারকম আওয়াজ করছে। তাছাড়া এক একসময় হারমোনিয়ামের ওপর ঝুঁকে পড়ে এমন দ্রুত বেলো করছে আর চেঁচাচ্ছে যে, এই ভেবে সান্ত্বনা পাওয়া যায়—গানের বাণী রবীন্দ্রনাথের লেখা—এখন অশোকতরু যাই করুক—গানের ভাষা তো টিকে থাকবে—সেই একটা আশার কথা। মুখে বলল, শুনে যাও—দেখে যাও।

ময়ূরাক্ষীর মেইন ক্যানাল থেকে ব্রাঞ্চ ক্যানাল কাটানোর কাজ চলেছে। একদিন বিকেলে কণ্ট্রাক্টর বললো, চলুন না বেড়িয়ে আসবেন।

হেমন্ত কথাটা পাড়তেই রাজেশ্বরীও রাজি হয়ে গেল। আসলে খালকাটার দিকে ওরা গেলই না। দুবরাজপুর ফেলে সিউড়ির পথে একটা বাংলো পেয়ে গেল। রাতে পৌঁছে হেমন্ত, সুশান্ত, রাজেশ্বরী রোডসের বাংলোর বারান্দায় দেখল কাঠের আঁচে মাংস চেপেছে। তাদেরই জন্যে। কাজ থাকলে ঠিকাদাররা বড় অনুগত হয়। বাড়ির চারিদিকে ফাঁকে ফাঁকে বসানো শালগাছের পাহারা।

বর্ধমান থেকে সন্ধ্যের ঝোঁকে একটানা জিপগাড়িতে ছুটে এসে নামা। এদিকে বৃষ্টি নেই। দুধারে নানা হাইটের মঞ্চের মত থাক থাক চাষের মাঠ নেমে গেছে। সর্বাঙ্গ কেটে নেওয়ার পর একটি

বিশাল বটের শুধু কাণ্ডটুকু মৃত্যুদণ্ড মাথায় নিয়ে দাঁড়ানো। তার বাইরে জ্যোৎস্না এত ফিকে যে আর কিছু দেখা গেল না।

সারাটা পথ সুশান্ত তার এই নতুন পাতানো পিসির সঙ্গে বক বক করতে করতে এসেছে। হাওড়া থেকে ট্রেনে চেপেই সুশান্ত এই নতুন একজনকে বাবার সঙ্গে কথা বলতে দেখে প্রথমে আড়ষ্ট হয়ে গিয়েছিল। কয়েক স্টেশন যাবার পর দিব্যি গিয়ে সুশান্ত রাজেশ্বরীর গা ঘেঁষে বসল।

ছেলে বাথরুমে পা ধুতে গেল। হেমন্ত রাজেশ্বরীর পাশে সিঁড়ির ধাপে বসল। বাংলোর লোক ছাড়াও ঠিকাদারের একজন লোক সব সময়ের জন্য একপায়ে খাড়া। রাজেশ্বরীর সামনে এসব দেখতে বেশ ভালোই লাগছিল হেমন্তর। তোমার ছোট দু'ভাই কত বড় হল?

একজন আমাদের পাড়াতেই ঘুরে বেড়ায়। থিয়েটারের দল আছে।

বড়জন? মিহির নাম ছিল তাই না। এখন কত বড় হল—

অনেক লম্বা হয়েছে। বিয়ে করবে বলে ক্ষেপেছে। নতুন চাকরি। আমি বলছি, মা বোঝাচ্ছে—একটু গুছিয়ে নে তারপর বিয়ে কর—তা নয়।

এই যে চলে এলে—একেবারে পরশু ফিরবে—কেউ কিছু বলবে না। মাসিমা?

আমাকে তো প্রায়ই বেরোতে হত আগে। ডক্টর শ্রীবাস্তবের সঙ্গে তো এভরি ফর্ট নাইটে বেরোতাম। ফারমারস্ ফিল্ডে ডেমনস্ট্রেশন থাকত। যেখানে যেমন অবস্থা। বীরভূমে এলে বোলপুরের টুরিস্ট লজে এ সি কটেজ বুক করা থাকত আমাদের জন্যে। ডক্টর শ্রীবাস্তবের নাম শোনো নি? অতবড় প্ল্যাণ্টপ্যাথোলজিস্ট?

জ্যোৎস্নায় সিঁড়ির ধাপে গা ঘেঁষে বসা রাজেশ্বরী একেবারে অন্যরকম। ওদের কোম্পানির ওষুধ সারা পৃথিবীর ধানক্ষেতে লাগে সেখানে চাষীদের কাছে পপুলার করতে ফি'বছর ড্রাইভ নেওয়া হয়।

এসব কথা এ ক'মাসে রাজেশ্বরীর মুখে হেমন্ত শুনেছে। অ্যাগরোনমিস্ট ফিল্ড অফিসার, সেলস্ প্রমোশনের লোকজনকে মাঠে দরকার হয়—কিন্তু রিসেপসনিস্টকে কি কাজে লাগত ?

পৃথিবী জুড়ে কত প্ল্যান্টপ্যাথোলজিস্ট আছে! আমি চিনব কি করে? আমি তো ইরিগেশনের সেকশন অফিসার।

ডক্টর শ্রীবাস্তবের কটনের ওপর কাজ ওঁকে ওয়েস্টার্ন ইণ্ডিয়ায় ফেমাস করেছে? বিহারে মকাইয়ের একরকম পোকা হয়—সেগুলো উনিই ওষুধ দিয়ে তাড়িয়েছিলেন। ইস্টার্ন ইণ্ডিয়ায় ওঁর ধানের ওপর রিসার্চ কাজও কম ইমপর্টান্ট নয়।

আরও অনেক কিছু বলত। সুশান্ত পা ধুয়ে বসল ওদের পাশে। হেমন্ত থামিয়ে দিল রাজেশ্বরীকে। অন্য পুরুষের প্রশংসা আমি তোমার মুখে একদম সইতে পারি না।

চোখের ইশারায় ছেলেকে দেখলো রাজেশ্বরী। তারপর নিচু গলায় বলল, খুব ভালো লোক ছিলেন—

সুশান্ত রান্নার লোকের পাশে উঠে গেল। এ বাংলোয় অনেকদিন বোধহয় কোন বাচ্চা ছেলে আসে নি। রান্নার লোকটি হ্যাজাক জ্বালিয়ে টাঙিয়ে নিয়েছে। সুশান্তকে সে বলল, কাল সকালে এই সামনের ডাঙাল জমি পেরিয়ে শালবন দেখাবো।

ডাঙাল কি ?

রাজেশ্বরী সিঁড়ির ধাপে বসেই বলল, কাল আমি তোমাকে দেখাবো। উঁচু মত অনেকটা জায়গা তাতে কিছু জন্মায় না। এখানে নেমে খুব নিচু গলায় হেমন্তকে বলল, যেমন আমি!

হেমন্ত কোন কথাই বলতে পারল না। তার মনে অনেক প্রশ্ন আসছিল। এই ডক্টর শ্রীবাস্তবটা আবার কে! কিন্তু মুখে কিছু এল না। খুব আস্তে বলল, আমিই কারণ! তাই না—

জানি না। খানিক থেমে থেকে রাজেশ্বরী একা একা বলেছিল—তোমার বিয়ের পর আমি টোটো করে ঘুরতাম খুব। যেখানেই

চাকরির জন্যে লাইন দিই—দেখি যে মেয়েটার গায়ে কিছু মাংস আছে—সেই কাজ পেয়ে যায়। বাকি আমরা ওয়েটিং লিস্টে। গায়ে পায়ে কিছু না থাকলে শিকে ছেঁড়ে না। আমি ঘুরতে ঘুরতে পুরুষলোক চিনে ফেলেছি—

সবাইকে ?

মোটামুটি। আমাদের জুতো পায়ে দেওয়া এই লোয়ার মিডিল ক্লাসে মেয়েদের অধিকার একটাই। সন্তান ধারণের। তাও নিজের ইচ্ছেয় নয়।

রাজেশ্বরী এখন তুমি সোসিওলজি কপচাচ্ছ ?

হেমন্তকে কোন আমলই দিল না রাজেশ্বরী। এর চেয়ে বরং লেবার ক্লাসের মেয়েরা আমাদের চেয়ে অনেক স্বাধীন। আমরা ভদ্রতা, লোকলজ্জার বোঝা বয়ে বেড়াব। পুরনো সবকিছু ট্র্যাডিশান বলে ভাঙতে ভয় পাব। ওরা দেখ কেমন ফ্রি। মনের মানুষ বেয়াড়া হলেই বদলে ফেলবে। নতুন করে বিয়ে বসবে। খাটবে খাবে। কিছুকাল হিন্দুস্থান লিভারের মারকেট রিসার্চ ডিভিশনে কাজ করেছিলাম হেমন্ত। কোল ফিল্ড এরিয়ায় তিনমাস কাজ হয়েছিল। দেখলাম—ওরাই কনজিউমার গুডসের পোটেনসিয়াল বায়ার। ওরা বিয়েতে রঙীন সাবান প্রেজেন্ট করে বলে এতদিনকার প্রোডাক্ট—সাদা লাক্স—চিত্রতারকার সৌন্দর্য সাবান! —ওদের মনোরঞ্জন করতে পাঁচরকম রঙে রঙীন করা হলো!

এই যে বলছিলে তোমরা শুধু ওয়েটিং লিস্টে থাকতে! কাজ পেতে না ?.

বাঃ হাসপাতাল থেকে ফিরে এসে তো লিভারের কাজটা পেলাম।

হাসপাতালে গিয়ে গায়ে পায়ে লাগল !

তা বলতে পার। রাজেশ্বরী জ্যোৎস্নার ভেতরে দাঁড়ানো শালের সারির দিকে তাকিয়ে বলল, টি বি থেকে সেরে উঠলে লোকের চেহারা প্রথম প্রথম খুব ফিরে যায়।

টি বি হয়েছিল ?   কতদিন হাসপাতালে ছিলে ?

আট মাস। ভয় নেই। জানো নিশ্চয় আজকাল ফুল কিওর হয়। তারপর গম্ভীর হয়ে গেল রাজেশ্বরী। তোমার জন্যেই কি না জানি না—জীবনটা এত মিনিংলেস লাগত। ঘুরে বেড়াতাম। চোখের নিচে ছানি পড়ে গেল। আগে পাড়ার ছোকরারা যারা একটু আধটু ফলো করত—তারাও ছিটকে বেরিয়ে গেল। বাবাকে তো জানতেই সংসার কেমন দেখতেন! আমার জেদ চেপে গেল। বুকের ছবি তুলে সিওর হলাম—আমি সিক। হাতে পয়সা নেই। চক্রবেড়ে রোডে এক লিডার থাকতেন। তখন তার চল্লিশ বেয়াল্লিশ হবে। বউ সদ্য গত। ছলাকলা করে কথা দিলাম—হাসপাতাল থেকে বেরিয়েই তাকে বিয়ে করব. জানো হেমন্ত—তখনো দিন ভাল ছিল! লোকের বিয়ের ইচ্ছে থাকতো!

এখানে থেমে হেমন্তর মুখের দিকে তাকালো রাজেশ্বরী। তখন আমার আর কোন উপায় ছিল না হেমন্ত। ঠিক করে নিলাম—যে করে হোক আমাকে বাঁচতেই হবে। তোমার ছবি আমার কাছে তখন একদম মুছে গেছে।

এবার রাজেশ্বরী দম নেওয়ার জন্য থামল। কণ্ট্রাক্টরের জিপের ড্রাইভার বাংলোর পাহারাদারের ঘরের সামনে দড়ির খাটিয়া বের করে শুয়ে আছে। লোকটা ফরসা। সাদা বুকে রুপোর লকেট হবে—চাঁদের আলোয় ঝকঝক করে উঠছে। সুশান্ত এখন রান্নার লোকটির সঙ্গে বারান্দার কোণে চলে গেল। লোকটি ফেন গালছে। মাংস হয়ে গেছে। গরম মসলা দিয়ে নামাচ্ছিল খানিক আগে। সুশান্ত কোনদিন এমন বাবার সঙ্গে বাইরে বেরোয় নি। রান্না করতে পারে এমন বয়স্ক বন্ধু পায় নি কোনদিন।

হাসপাতালে আগে তো কোনদিন এত নিয়মে থাকি নি। দু'মাসের ভেতর সি এম ও জ্বালাতে শুরু করল। আয়না ছিল না। বুঝলাম শরীর ফিরছে। খারাপ লাগত না। ওষুধপত্র নিয়মমত পড়ল।

সেই লিডার ফি হপ্তায় আপেল, আঙুর নিয়ে শনিবার বিকেলের ট্রেনে যেতেন। রাতটা হোটেলে কাটিয়ে পরদিন বিকেলে কলকাতা ফিরতেন। কত হাউস লোকটার। হাসপাতালে মেয়াদ ফুরানোর হপ্তা দুই আগে আমার জন্য এক কৌটো সিঁদুর এনেছিল। একটা টিপ পরানোর জন্যে খুব বায়না ধরেছিল। অবশ্য ডিসচার্জ হওয়ার আগেই আমি নিজেই কেটে পড়েছিলাম। বাসে একা একা কলকাতায় চলে আসি।

খেতে বসে অজানা জায়গায় হ্যাজাকের আলোয় সুশান্তর বেশ লাগছিল। তারপর কতদিন পরে মায়ের মত একজন লোক তাকে ভাত মেখে দিল। আঁচিয়ে ঘুমিয়ে পড়তেও দেরি হল না সুশান্তর। ব্রিটিশ আমলের বাংলো। ওপরে ছনের ছাউনি—দেওয়ালটা চওড়া করে মাটি দিয়ে বানানো। মেঝে লাল সিমেন্টের। বাথরুমগুলো ঝকঝকে তকতকে।

জিপের ড্রাইভারের ট্রানজিস্টরে বিবিধভারতীর মাঝামাঝি খবর শুরু হল।

পাশাপাশি দু'খানা ঘরে বিছানা পেতে দিয়েছে নতুন চাদরে। টিপয়ে খাবার জল ঢাকা দেওয়া। হেমন্ত সিগারেট ধরালো।

খবরের ভেতর দিয়েই রাজেশ্বরী বলল, এরকম একদিন খবর শুনছি—স্থানীয় সংবাদ। তখন ওঁর ডেথ্‌ নিউজটা বলল।

কার ?

ডক্টর শ্রীবাস্তবের। ব্রেনে হেমারেজ—

খুব ফেমাস লোক ছিল বুঝি !

কটন, রাইস, টোবাকোর কত রকম প্ল্যান্ট ডিজিজ, ব্যাকটিরিয়াল বাইট হতে পারে—সব ব্যাপারেই শান্তি অথরিটি ছিল।

হেমন্ত তাকিয়ে আছে দেখে রাজেশ্বরী ডেকে বলল, ওঁর পুরো নাম ছিল শান্তিস্বরূপ শ্রীবাস্তব। নিজের হাতে নিজের ভাগ্য তৈরি করেছিল। সব বুঝতাম না ওঁর। তখন ছুটে ছুটে আসত আমার কাছে—

কয়েকদিন আগে ইণ্ডিয়ান মিউজিয়ামের সামনের ঘটনা যে-আদৌ ঘটে নি। ঠিক এইভাবে রাজেশ্বরী হেমন্তকে বসালো। হাতে উলের কাঁটা। সামনে খোলা পড়ে আছে গল্পের বই। ক'দিন এলে না যে।

এতগুলো লোক সাক্ষী রেখে তো বলা যায় না, তোমাকে দেখতে ভীষণ ইচ্ছে বলেই আসি নি। তাহলে খুব খারাপ শোনাবে। আলগোছে বলল, এমনি কাজ পড়ে গেল খুব।

পাঁচটি মেয়ে টিফিনের সময়টুকু আগাগোড়া খুব মন দিয়ে হেমন্তকে দেখল। ঠিক চ'টোয় কেরানীবাবুদের সঙ্গে সঙ্গে সুইংডোর ঠেলে যে-যার ঘরে যাবার আগে আবার হেমন্তকে দেখল।

ওরা চলে যেতেই ভিজিটর্স রুম একদম ফাঁকা। তুমি সেদিন অমন ফলো করছিলে কেন বলতো?

খুব ন্যাচারাল। তোমার তো কিছুই হয় নি। হয়েছে আমার—তাই আমি কষ্ট পাই।

রাজেশ্বরী বুঝলো অন্যরকম। আমি তো সত্যি কিছু পাই নি। আমার জীবনে তো সত্যি কিছু হয় নি হেমন্ত।

পুরনো হিসেব করতে বসতে ভাল লাগছিল না। হেমন্তর মনে অভিমান ছিল। রাগ ছিল। কিন্তু এমনই মুশকিল—কিছুতেই রাজেশ্বরীকে ধরা যায় না। শক্ত করে ধরে চলত, তুমি এত কঠিন কেন? এই দেখ, এবার আমি আর তোমাকে ছাড়ছি নি।

রাজেশ্বরী বলল, তোমাদের তো সবকিছু হয়েছে। সংসার, ছেলেমেয়ে, বউ, ভালবাসা। আমার কি হল বলতে পার? তোমরা আমার কাছে কেন আস তা আমি জানি—

এমন সময় বাইরে থেকে ডি জি এফের একটা ফাইল এল। দু'জন ডিলার এসে ঢুকলো। তাদের অ্যাগ্রো ডিভিশনে পাঠিয়ে দিয়ে রাজেশ্বরী বলল, সত্যি করে বলতো হেমন্ত—আমার দিকে যখন তাকাও তখন তোমার মনে হয় না আমি কিছু পরে নেই। শাড়ি

সেই .। ব্লাউজ না। কিছু না। আমি তোমাদের জানি। আমার গায়ে এসব না থাকলে—নির্জন ঘরে—তোমরা কেমন বেসামাল হয়ে পড়—সবতো আমি দেখি!

এখানে এসে রাজেশ্বরী এমন হা হা করে হেসে উঠল—আলজিভ অবধি নিওনের আলো চলে গেল, চোখের কোণ কুঁচকে জলের ফোঁটা বেরিয়ে পড়লে আশ্চর্যের কিছু ছিল না।

তুমি আমাকে ওভাবে কথা বলছ কেন, রাজেশ্বরী। আমি তোমাকে সব সময় ওভাবে চাই নি। আমি তোমাকে চাই।

রাখো! ওরকম কথা সবাই বলে! শেষ অবধি কি তাও আমি জানি। এখানে এসে থেমে গেল রাজেশ্বরী। তারপর বেশ কঠিন করেই বলল, আর জানি বলেই আমি এরকম। মনে পড়ে হেমন্ত—লিফটের গোড়ায় রাইটার্সে তেতলায়—বছর বারো আগে—একটা আনওয়াণ্টেড্ লোকের চেয়ে ক্রুয়েলি আমাকে ট্রিট করেছিলে। মুখের ওপর সবচেয়ে কঠিন—সবচেয়ে আশ্চর্য কথা বলেছিলে একটা রোগাটে নিরুপায় মেয়েকে। যে টলতে টলতে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গিয়েছিল!

আমায় ক্ষমা কর। ক্ষমা কর রাজেশ্বরী। আমি বুঝি নি। অবশ্য তাই বা বলি কি করে। আমি অন্যায় করেছি।

তাই বা বল কোন্ মুখে? সেদিন তো আমি অবিশ্বাসের কিছু করি নি। আমি কত সরল ছিলাম। কিছুই জানতাম না। তুমি যা বলতে তাই করতাম সেদিন। কোলের ওপর দুখানা হাত রেখে খানিক চুপ করে বসে থাকল রাজেশ্বরী। আস্তে আস্তে বলল, তাই বা বল কোন্ মুখে? তুমি তো দেখেশুনেই বাসবীকে বিয়ে করেছিলে। করো নি?

আমার ভুল। আমার ভুল রাজেশ্বরী।

তাকে ভালবাসতে না? ভালবেসে তোমাদের ছেলে হয় নি! এর ভেতর ভুল কোথায়? একেবারে সামনাসামনি পড়ে গেছ আমার—তাই এলোমেলো বকে সাদা কথাগুলো ঢাকতে চাইছো।

মানুষ তো পাল্টায় রাজেশ্বরী। একটা চান্স দিয়ে দেখ না—

অনেক দেরি হয়ে গেছে হেমন্ত। এসব কথা আগে যদি বলতে তবে খুব ভাল হত। আমিও হয়ত অন্যরকম হতাম। তার চেয়ে বল, মানুষের স্বাদ পাল্টায়—তোমার মনে আছে? সেই যে টি বি হাসপাতালের সি এম ও-র কথা বলেছিলাম—ঘরে বউ থাকতেও একদিন বিকেলে হসপিটাল বেডে আমায় জাপটে ধরেছিল—সেখানে কোন আয়না ছিল না—তখনই বুঝলাম আমি সুন্দরী হয়ে উঠছি—নিয়মে থেকে থেকে বিশ্রামে আমার সারা গায়ে মুখে মানানসই, মাপমত মাংস লেগেছে! মাংস জিনিসটা বড় অদ্ভুত! আরামে তৃপ্তিতে গায়ে ফ্যাট হয়। আর তা দেখে দেখে তোমরা খাবি খাও। বড় জানতে ইচ্ছে করে—না জানি রাজেশ্বরীর ভেতরে কি আছে। বিশ্বাস কর—আমি সামান্য একটা মেয়ে মাত্র। নরম। নিরুপায়। একা—কেউ নেই আমার হেমন্ত।

আমি তোমার সেবা করব রাজেশ্বরী। তোমার কোন কষ্ট রাখব না। তুমি যেখান থেকে হেঁটে যাও সে জায়গাটাও আমার চেয়ে ভাগ্যবান। তোমার মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করতে ইচ্ছে করে—

এই কি হচ্ছে! ভাল হবে না কিন্তু হেমন্ত। অমন কথা আমার সামনে বলবে না। একদম বলবে না। এখানে এসে হেসে ফেলল রাজেশ্বরী।

চল না আমরা কোথাও বেরিয়ে পড়ি।

তোমার ছেলে?

সুশান্তকে বৌদির কাছে রেখে যাব।

তা হয় না। গেলে সুশান্তকে সঙ্গে নিয়ে যাব। ওর মা কি একবারও আসে না?

মাঝে মাঝে আসে। আমি যখন বাড়ি থাকি না।

পরশু চল। ডুবরাজপুরের ওদিকটায় রাস্তা এমন সুন্দর—

শালবন—রোড্সের ডাকবাংলো আছে। কিংবা চল যাই পায়রাটুঙ্গির ডাকবাংলোয়। সামনেই রূপনারায়ণ। কাশবন। কাছেই তমলুক শহরের বুকে বর্গভীমার জাগ্রত পীঠ। উঁহু। শালবন আমার বেশি ভাল লাগে। দেবস্থানের কাছে গিয়ে চোখ খুলতে পারি না হেমন্ত। বড় অপরাধী লাগে নিজেকে—

তুমি পবিত্র রাজেশ্বরী। তোমার গায়ে কোন পাপ লাগে নি।

ভেবো না তুমি আমাকে পেয়েছো। তা কিন্তু পাও নি। আমি ইচ্ছে হলে তবে তোমার হই। নাহলে নয়—চেষ্টা করে যাও। বার বার চেষ্টা কর। একদম থামবে না কিন্তু। তাহলে আমি ইণ্টারেস্ট হারিয়ে ফেলি।

একটু ইচ্ছে কর না কাইগুলি।

এই এক দোষ তোমাদের। পুরোপুরি দখল না করতে পারলে সুখ পাও না।

ভয় হয় সব সময়। যদি হারাই।

ভাল। খুব ভাল। এরকম ভাব থাকলে আমাতে টান থাকবে তোমার।

আমার তো টানের কোন অভাব নেই।

বুদবুদ, গলসি, পালহানপুর, হেতমপুর—সব জায়গা জিপের স্পীডের মুখে এলোমেলো হয়ে যাচ্ছিল। রোড্সের বাংলো থেকে ভোর ভোর রওনা দিয়েছে হেমন্ত। পেছনের সিটে রাজেশ্বরীর কোলে মাথা রেখে সুশান্ত ঘুমিয়ে পড়েছে। বাইরোডে একটা ঘুমপাড়ানি ঝাঁকুনি থাকে জিপের। রাজেশ্বরীও ঘুমিয়ে পড়েছে। কপালে চুলের গুছি উড়ে উড়ে পড়ছিল। ড্রাইভারের বুক খোলা শার্টের ভেতরে কালরাতের সেই রুপোর লকেটটা এখনো ঝকমক করছে। সামনেই বর্ধমানে গাড়ি থামিয়ে চা খেতে হবে।

হেমন্ত নিজেকে বলল, তুমি কি সত্যিই রাজেশ্বরীকে দখল করতে পেরেছো ?

আলবৎ পেরেছি। আজই ভোররাতে ও যখন কাঁদড়ের পাড়ে বসে পড়ল—আমার তখন হয়ে গেছে—জ্যোৎস্নায় সাদা শালুক ফুল প্রাচীন কালো জলে ঝকঝক করে জ্বলছিল—আমি তখন ওকে দখল করলাম। সেই সময় রাজেশ্বরী মাটিতে বসে পড়ে ঘাসের ওপর আঁচল মেলে দিয়ে একটা অতিকায় সাদা শালুক ফুলের ধারায় জ্যোৎস্নায় আমূল বিঁধে গেল।

. ভাল! নিজেকেই যেন বলল হেমন্ত। ইরিগেশনের সেকশন অফিসার হেমন্ত মিত্তির। কণ্ট্রাকটরের ছুটন্ত জিপে বসে। দু'পাশে সদ্য রোয়া ধান। রাঁচি হাজারিবাগের ক্ষেতমজুর মেয়ে পুরুষরা মাথা নিচু করে ধান রুইছে। নিড়ন দিচ্ছে। মাইল পোস্টগুলো ছিটকে বেরিয়ে যাচ্ছিল।

বেলা সাড়ে এগারোটা নাগাদ জিপ যখন কলকাতার বাড়ির সামনে থামল, সামনের সিট মুড়ে দিয়ে রাজেশ্বরী নেমেছে, সুশান্ত বেরিয়ে আসছিল—এমন সময় অবিনাশকে সঙ্গে করে বাসবী একেবারে জিপের বনেটের সামনে দাঁড়ালো। এখন জিপ যাবে রাজেশ্বরীকে পৌঁছে দিতে। বাসবীকে দেখেই সুশান্ত মা বলে চেঁচিয়ে উঠেছিল—কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে থেমেও গেল। এ মা তো আগের মত নয়। সঙ্গে সেই অবিনাশ কাকু। স্কুলের বাস মিস করলে কতদিন তাকে ট্যাক্সি করে পৌঁছে দিয়েছে। এখন কি রকম রোগামত হয়ে গেছে।

কি ব্যাপার ?

সুশান্তকে নিতে এসেছি।

রাজেশ্বরী থমকে দাঁড়ালো। হেমন্ত কোন জবাব দিল না। বাসবী কটকট করে রাজেশ্বরীর দিকে তাকালো। রাজেশ্বরী খুব মৃদু হাসি ফুটিয়ে তাচ্ছিল্যের ভঙ্গীতে জিপের ড্রাইভারের পাশে বসে

পড়ল। কিন্তু তার আগে বাসবীর সরে দাঁড়ানো দরকার। না হলে জিপ ঘোরানো যায় না।

সুশান্তকে নিয়ে হেমন্ত কোন রকম ভ্রূক্ষেপ না করেই বাড়ির ভেতরে ঢুকছিল। বাসবী শক্ত করে ছেলের হাত ধরল। হেমন্ত এক ঝাঁকুনিতে সুশান্তকে ছাড়িয়ে নিল। সঙ্গে সঙ্গে বাসবী চেঁচিয়ে উঠল, সুশান্তকে আটকে রাখার কোন অধিকার আর নেই তোমার। আমি ছেলেকে নিয়ে যাব। ছাড়ো বলছি—দুশ্চরিত্র!

হেমন্ত হোহো করে হেসে উঠল। জায়গাটা ফুটপাথ। সুশান্ত এসব দেখে একছুটে বাড়ির ভেতর চলে গেল। জিপের সিটে রাজেশ্বরী। সেও হাসছিল মৃদু মৃদু। পাড়ার লোকজন অফিসে চলে গেছে। রকে কিছু ছেলে-ছোকরা। তারা এখুনি রঙ্গ দেখতে ছুটে আসতে পারে। হেমন্তর হাসি তখনো থামে নি। অনেকদিন পরে বাসবীকে দেখে তার মনে হচ্ছিল, কিছু ভারি—গলায় একটা নতুন বড় হার, হাতে হাতঘড়ি, শাড়িটা কটন বেনারসী—এই দুপুরবেলা কেউ এমন ক্যাটকেটে রঙের শাড়ি পরে। হেমন্ত আবারও হেসে উঠল। সে-হাসির সামনে বাসবী নিবে যাচ্ছিল। তাকে বাঁচাতে এবার অবিনাশ এগিয়ে এল, সুশান্তকে আটকে রাখার কোন অধিকার আপনার নেই—

তোমার আছে! তাই না!

বাসবীও একটু সরে দাঁড়িয়েছিল। সেই ফাঁকে ড্রাইভার জিপ ব্যাক করল। ঘুরে সাঁ করে বেরিয়ে যাবার মুখে রাজেশ্বরী এমন করে হেমন্তর দিকে হেসে তাকালো, যার মানে হয় একটাই—তোমার ব্যাপার, তোমার পরিবার—যা ভালো হয় তুমিই করবে—তুমিই বুঝবে—এসবে আমি কেউ নই—স্রেফ আউটসাইডার।

আলবৎ আছে। এবারে বাসবী গট গট করে ভেতরে ঢুকতে গেল। সুশান্তকে বের করে আনবে। পাড়ার ছেলেরা এগিয়ে আসছিল। হেমন্ত পথ আটকে দাঁড়াল।

মেয়েছেলে নিয়ে ফুর্তি করে বেড়াবেন বেড়ান—মাকে তার ছেলে ফেরত দিন। বাসবীর দিকে একবার তাকান হেমন্তদা। আমি বাইরের লোক—তবু বলছি ও খায় না, ঘুমোয় না। ছেলে ছেলে করে। একদিন শেষে মরে যাবে। তখন আর আপসোসের সীমা থাকবে না কারও।

কেন! তুমি বসে বসে আপসোস করবে অবিনাশ। তোমার তো নতুন বউ বাসবী। কষ্ট তো তোমারই বেশি!

এসব নিয়ে ঠাট্টা করবেন না। পস্তাবেন।

হেমন্ত সেদিক দিয়েই গেল না। তোমার গেঞ্জিকল চলছে কেমন? ক'গ্রোস গেঞ্জি—ক'গ্রোস জাঙ্গিয়া হয় রোজ?

কাজনামো রাখুন। ছেলে দিয়ে দিন মাকে।

নতুন বউ কেমন লাগছে? মরি! তোমার তো এই প্রথম বউ!

পাড়ার ছেলেরা ওদের ঘিরে দাঁড়িয়েছে এতক্ষণে। একজন বলল, কেন ঝামেলা বাড়াচ্ছেন হেমন্তবাবু। আপনি তো সারাদিন উড়ে বেড়াচ্ছেন। দিয়ে দিন না ছেলেটাকে মায়ের কাছে। সুশান্ত ভালোই থাকবে!

মাথায় রক্ত উঠে যাচ্ছিল হেমন্তর। সরস্বতী পুজো করে পাড়ার ছেলেগুলোকে ভালোরকম হাত করেছে অবিনাশ। কিন্তু ছেলে তো ঘরের আলনা কিংবা পাপোশ নয় যে এক কথায় ভাগবাঁটোয়ারা করা যাবে। তাছাড়া এই দুগ্ধপোষ্য ছেলেগুলোকে সে কি বলবে। এসব বিষয় আদালতে ঠিক হয়। তার আগে নয়। উপরন্তু আদালত তার দিকেই যাবে। বাসবীর সঙ্গে সেপারেশন হয় নি আজও—ডাইভোর্স্ তো দূরের কথা। এই অবস্থায় পরপুরুষের সঙ্গে কাটানোর দায়ে—রাত্রিবাস বাবদে—এভিডেন্স তাই বলছে—অবিনাশকে কম করেও পাঁচটি বছর হরিণবাড়ি বেড়িয়ে আসতে হবে অ্যাডালটারেশনের দায়ে। এসব কথা কি এই গেঞ্জিকলওয়ালা

জানে না। স্ট্রেঞ্জ! না, সব জেনেশুনেই অল্প মেহনতে একেবারে মুফতে ছেলেটাকে বাগিয়ে নিতে চায়।

পথ ছাড়।

আর সতী নারীর রোল প্লে করতে হবে না বাসবী, এবার বাড়ি যাও।

বাসবী মুখ তুলে হেমন্তকে কি একটা কথা বলতে যাচ্ছিল। এমন সময় পর্দা ঠেলে হেমন্তর বৌদি বারান্দায় বেরিয়ে এল, কি হচ্ছে ছোট বউ। পাড়া হাসাবি! ছেলের জন্যে মন কেমন করলে এসে দেখে যাবি। তোদের ও বাড়িতে আমি সুশান্তকে রাখতে পারব না। যেমন আসিস তেমন আসবি। ঠাকুরপো ঘরে চলে এস। কি আরম্ভ করলে তোমরা। ভাগ্যিস তোমার দাদা অফিসে বেরিয়ে গেছে।

থমকে গিয়ে বাসবী মাথায় ঘোমটা তুলে দিল। এবারে অবিনাশ অসহায়ের মত দাঁড়ানো। পাড়ার ছেলেদের ভিড় ভেঙে গেল। নিজের ঘরে ঢুকে জামা খুলতে খুলতে হেমন্ত দেখল, ওরা দু'জনে রাস্তা ক্রশ করে রিক্শার দিকে যাচ্ছে। মনে মনে বলল, খুব রিক্শা চড়া হয়!

সেদিন দুপুরে অনেককাল পরে ছেলেটার গলা জড়িয়ে দরজা জানলা আটকে ঘর অন্ধকার করে হেমন্ত ঘুমোলো। সুশান্ত বড় হয়ে যাচ্ছে। গায়ে এখন আলাদা গন্ধ। আজকাল আর রাক্ষস-খোক্কসের গল্প পড়ে না। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'চাঁদের পাহাড়' বইটা আজই কিনে দেবে বিকেলে। অ্যাডভেঞ্চার, স্বপ্ন কত কি আছে তাতে। খানিক পরে নিজেই হেমন্ত একটা স্বপ্নের ভেতরে জড়িয়ে গেল। শালবনের গায়ে যুগযুগান্তরের কাঁদড়। কবে পৃথিবী গড়ে ওঠার সময় সেখানকার চারদিকের মাটি ঢালু হয়ে নিচে নেমে গিয়েছিল। তাতে কয়েক শতাব্দীর বাসি জল। কালো, ফেনা। সেখানে নেমে সাদা শালুক ফুল তুলতে গিয়ে হাজারো লতার ভেতর তার পা আটকে গেল।

ভয় পেয়ে যখন ঘুম ভাঙলো তখন বেলা পড়ে গেছে। সুশান্তর ঘুম ভাঙে নি। জাগাতে মন সরলো না। বউদি চা করছিল। আজকাল হেমন্তর সঙ্গে তার এসব নিয়ে কোন কথা হয় না। চায়ের কাপ নামিয়ে দিয়ে বলল, হ্যাঁ ঠাকুরপো—জিপে বসেছিল ও মেয়েটি কে?

কার কথা বলছ। রাজেশ্বরী, ও তুমি চিনবে না।

খুব চিনি। সেই যে আমি কলেজ ছাড়ার মুখে আমাদের বাড়িতে আসতো তো।

মনে আছে দেখছি তোমার!

তুমিও তো ভোলো নি দেখছি! খুঁজে পেতে ঠিক বের করেছ। খুব সুন্দরী দেখতে হয়েছে! আমি একটা কথা বলি কি ঠাকুরপো— তুমি ওকেই বিয়ে করে আন। খুব মানাবে তোমাদের—

ক্ষেপেছো। আর আমি বিয়ে করছিনে। বয়স নেই।

খুব আছে। পুরুষমানুষদের আবার বিয়ের বয়স কি তুমি তো করলেই পার।

বাসবীর কি হবে?

মুখ পুড়িয়েছে। তার দাম দেবে। আমাদের মেয়েমানুষদের বারবার বিয়ে হয় না। আর অবিনাশের বয়স তো কম। বাসবীর চেয়ে ছোট। ছেলেটার মোহ কেটে গেলে বাবু যে কোথায় দাঁড়াবে। বাসু কিন্তু আবার আসবে আমি বলে দিলাম। দুধের ডিপোয় দেখে তুমি যে কেন ভুলেছিলে ঠাকুরপো তাই ভাবি আমি বসে বসে। ভাবতে ভাবতে আমার মাথা গরম হয়ে যায়। আর ক'দিন পরে ও যাবে কোথায়? তার চেয়ে তুমি ফিরে বিয়ে কর। মেয়েদের ভাগ্য মেয়েরাই ঠিক করে।

অনেকদিন পরে বিকেলে চান করে পাউডার মেখে পাঞ্জাবি চড়ালো গায়ে। ইনসাইড পকেটে নতুন নোট কিছু গুঁজে নিল হেমন্ত। তারপর ট্যাক্সি। বাতাসে মাথার চুল এলোমেলো হয়ে যাচ্ছিল। পকেট চিরুনি দিয়ে বারবার গোছগাছ করে নিতে হচ্ছিল

মাথাটা। আজই ভোররাতে আমি রাজেশ্বরীর দখল নিয়েছি। মৌরুসীপাট্টা!

দীর্ঘকাল পরে ভবানীপুরে কাঁসারিপাড়ায় ঢুকে হেমন্ত টের পেল, রাস্তার দু'ধারের দোকানপাটের চেহারা সত্যি পালটে গেছে। সি এম ডি এ রাস্তা অনেকটা চওড়া করেছে। মেয়েদের ব্লাউজের দোকান বসেছে। লোহার আঙটায় ধুলোমাখা সারিসারি ব্রেসিয়ার। রাজেশ্বরীদের চকে আগের মতই জটলা। তবে নতুন মুখ।

ভেতরে ঢুকতেই বাঁধানো উঠোনে রাজেশ্বরীকে পেল। পায়ে চটি। ঝুঁকে পড়ে টিনের ঝারি থেকে টবের গোলাপে জল দিচ্ছিল। পা পর্যন্ত আঁচল। কাঁধে চাবির গোছা। একেবারে আটপৌরে রাজেশ্বরী। এরকম কোনদিন দেখে নি হেমন্ত।

ওমা। কি মনে করে? এস এস। জলের ঝারিটা উঠোনের কোণে রেখে হাত ধরে হেমন্তকে ঘরে নিয়ে গেল। কোন জড়তা নেই। ঘরের দেওয়াল ডিসটেম্পার করানো। চীনে লণ্ঠনের স্টাইলে সিলিং থেকে বাল্‌ব নেমে এসেছে। ফারনিচার নতুন নতুন। ড্রেসিং টেবিলের পাশেই ফল্‌স্‌ চুলের গুছি ঝুল্‌ছিল। কথা বলতে বলতে রাজেশ্বরী তা লুকিয়ে ফেলল, কি ব্যাপার? একদম না বলে কয়ে।

তোমাকে এরকম কোনদিন দেখি নি তো।

আমি কত রকমের! তার কি খবর রাখো তুমি।

এত সুন্দর সাজানো ঘর। আগে অন্যরকম ছিল না?

তা ছিল। চাকরিতে ঢুকে ইনস্টলমেণ্টে সব করেছি। হায়ার-পারচেজে দাম কিন্তু বেশি পড়ে যাই বল। এই সোফা-কাম-বেডের দাম পড়ে গেল পাঁচশোর ওপর। খুব ইচ্ছে মোরাদাবাদী একটা কারপেট রাখি এ ঘরের মেঝে জুড়ে—মেলে দিলে আগাগোড়া ঢাকা পড়বে।

কালো জমির তাঁতের শাড়ি—তাতে লাল সুতোর ফুলতোলা পাড়। মুখখানি খুব ঘরোয়া। কানে সিম্পিল্‌ দুল। নাকের পাটায়

সস্তার ছ'আনা দামের কাঁচ বসানো একটা নাকছাবি এইমাত্র ঢাকা আলোর ছায়ায়, আলোতে হেমন্তর চোখে অসাধারণ হয়ে উঠল। সে আর চোখ ফেরাতে পারছিল না। পায়ের লতাপাতা আঁকা স্ট্র্যাপের চটিজোড়া ও এই শাড়িখানি বাড়ির প্রাচীনতা মেখে নিয়ে লাবণ্যের একটুকু অঙ্গ হয়ে গেল। হেমন্ত নিজের মনে মনে আস্তে গাইল, যদি জল আসে আঁখি পাতে—

ওকি! গাইছো নাকি! ওমা আমার কি হবে গো! বলেই রাজেশ্বরী গদি লাগানো সোফায় বসে পড়ল।

হারমোনিয়াম আছে?

না। নিয়ে আসব? মাসীমার ঘরে আছে—

থাকগে—

গাও না।

খালি গলায় গাইছি। আজ হেমন্তকে সাধবার দরকার ছিল না কোন। আজ তোমারে দেখতে এলেম অনেক দিনের পরে। ভয় করো না—সুখে থাকো—ও—ও—ও।

এমন তন্ময় হয়ে হেমন্তর দিকে বহুকাল তাকায়নি রাজেশ্বরী। তার মনের ভিতের বাগানে ফুলগুলো বাতাসের আদর কুড়োচ্ছিল। মেলে দেওয়া একখানা শাড়ির আঁচলও সেই বাতাস খেয়ে ঢেউ তুললো। যাকে বলে চিত্রার্পিত—তাই হয়ে বসে আছে রাজেশ্বরী। হেম সেলাইয়ে মোড়া ব্লাউজের হাতার শেষেই দু'খানি হাত একদম ক্যাণ্ডিডেটের মুডে কোলের ওপর জড়ো করা। হেমন্ত ঘুরিয়ে গাইল, বেশিক্ষণ থাকবো না। এসেছি দণ্ড দুয়ের তরে—এ—এ—এ।

কে গায় গো এমন সুন্দর। বলতে বলতে যিনি ঘরে ঢুকলেন তাকে দেখে চমকে গান থামিয়ে ফেলল হেমন্ত। মা। রাজেশ্বরীর মা। হাঁটা দেখেই বোঝা যায় চোখের দৃষ্টি হারিয়েছেন। মানুষ যে বারো তের বছরে কত বুড়ি হয়ে হয়ে যেতে পারে রাজেশ্বরীর মাকে না দেখলে হেমন্তর তা জানা হোত না কোনদিন।

তুমি আবার এলে কেন ? ভেতরে যাও মা।

আবার কাকে এনে বসালি। ভাবলাম যাই শুনিগে গানটা। কে গো তুমি ? আমাদের এখানে অনেকে আসেন তো !

হেমন্তর ভেতরটা ধক্ করে উঠল। ঘরের ভেতর এত দামি দামি ফারনিচার— পর্দা, আয়না. ছবি—কতরকমের সব আলো ঘেরটোপ লাগানো অবস্থায় সিলিং থেকে ঝুলছে। তার ভেতরে রাজেশ্বরীর মাকে মোটেই মানাচ্ছিল না। অথচ সবটাই সত্যি। চাকরি করে, আয় করে রাজেশ্বরী যে ভয়ঙ্কর স্বাধীন হয়েছে—তা ওর গলা থেকেই ফুটে উঠল, যাও বলছি—ভেতরে যাও মা। ভাল হবে না বলছি কিন্তু। শুয়ে পড়গে—

কত আর শোব বলতে পারিস। কে গাইছিল রে ? থামলে কেন। গাও না শুনি—

আমি হেমন্ত মাসিমা !

কে ?

আমি হেমন্ত মিত্তির। আপনার মেয়েকে ঠকিয়েছিলাম।

ওর গলায় কি ছিল। রাজেশ্বরী সোফা থেকে উঠতে পারল না। পর্দাগুলি পাখার হাওয়ায় দুলছে।

রাজেশ্বরীর মা যেখানে ছিল—সেখানেই দাঁড়িয়ে পড়ল। অর্থহীন দুই চোখে দু'ফোঁটা জল এসে দাঁড়াল। অনেকক্ষণ পরে খুব আস্তে বলল, তুমি সেই হেমন্ত ! যে আসতো।

তারপর আরো অনেকক্ষণ সময় নিয়ে রাজেশ্বরীর মা ঘর ছেড়ে চলে গেল।

তুমি এ কি করলে বলতো ?

যা সত্যি তাই বলেছি, আমাকে শাস্তি পেতে দাও রাজেশ্বরী।

তার চেয়ে অনেক বেশি শাস্তি পাবে আমার মা। কেন বলতে গেলে ?

হেমন্ত মুখ তুলে তাকালো। সস্তার নাকছাবির কাঁচের কুচিতে

আলো ঝিকিয়ে গেল। দীর্ঘ চোখের কোণে টলমল করে এক ফোঁটা জল এসে দাঁড়াল। মা জানেন, তুমি নেই। তাই বলেছিলাম: আমার চেয়েও মা সেদিন বেশি কষ্ট পেয়েছিল। বড় আশা করেছিল কি না! বোকা!

ঘরের ভেতরটা বাতাসের চাপে, আলোর চাপে গম্ভীর হয়ে গেল। তার ভেতরেই হেমন্ত আটপৌরে রাজেশ্বরীর কাছাকাছি গিয়ে মেঝেতে প্রায় হাঁটু মুড়ে বসল--যাকে বলে নিলডাউন—ওর বুকের কাছে কাছে রাজেশ্বরীর ভাঁজ করা হাঁটু, সামান্য ঢালু কোল—তার ওপর থেকেই নির্মেদ কোমর একেবারে স্তনাঢ্য বুকে গিয়ে মিশে গেল। আমার শান্তি দরকার রাজেশ্বরী। খুব শান্তি। আমি তোমাকে চাই। তুমি শুধু 'না' বলে যাও। আমি তবু চাইতে থাকব রাজেশ্বরী। তুমি যেমন ফিরিয়ে দিচ্ছ—তেমন ফিরিয়ে দিতে থাকো।

আলগোছে ওর ডান হাতখানা হেমন্তর কাঁধে রাখল রাজেশ্বরী। উঠে বস। কি খাবে বল।

কিচ্ছু না। আমাকে এইভাবে বসে থাকতে দাও।

সেটা কি খুব ভাল হবে! কে এসে পড়বে। ওঠো।

হেমন্ত উঠলো না। নিজের মাথাটা সেই নরম কোলে পুরু ঘাস জ্ঞানে চোখ বুজে রাখল। এখানে এখন শান্তি। রাজেশ্বরী ওর দু'খানা হাতই হেমন্তর চুলের ওপর আলগোছে রেখেছে।

আমি তোমাকে বিয়ে করব। তুমি না বলতে পারবে না রাজেশ্বরী। আকাশ ঘুরে ঘুরে একটা বুড়ো এরোপ্লেন যাচ্ছিল। তার একঘেয়ে আওয়াজটুকু মৃগী রোগীর মত গোঁ গোঁ শব্দের চেয়েও একটানা—চারদিক থেকে অন্ধকার কালো করে দেয় মন। তুমি যেখানে থাকবে আমি সঙ্গে সঙ্গে থাকব রাজেশ্বরী। তোমার কোন অসুবিধা করব না। আমি তোমারই মত করে তোমার সঙ্গে থাকতে চাই।

তা আর হয় না হেমন্ত। অনেক দেরি হয়ে গেছে। আমি আর সে রাজেশ্বরী নেই। আমরা এখন আলাদা আলাদা লোক। গায়ের গন্ধ আলাদা। স্বভাব আলাদা। কিছুই মেলানো যাবে না। শেষে শুধু খিটিমিটি লাগবে।

কোন অসুবিধা হবে না। তোমার স্বভাব পালটাতে বলছি না আমি। আমি শুধু সঙ্গী। যারা তোমার কাছে আসে—তাদেরও কোন অসুবিধা হবে না রাজেশ্বরী। আমি শুধু সেবা করতে চাই। শান্তি পেতে চাই।

আসলে আমাকে দখল করতে চাও! সেটি হচ্ছে না হেমন্ত। এখানে হেসে ফেলল রাজেশ্বরী। তোমাদের এই এক রোগ। আমি কিছুতেই ধরা দিচ্ছি না। আমারও তো বয়স হল। আর ক'টি দিনই বা সুন্দরী থাকব!

অনন্তকাল।

আমিও তো মানুষ হেমন্ত। বুড়ি হলে আর পাঁচজন বুড়ির মতই দেখাবে। তখন তোমার সব মোহ চটে যাবে।

তুমি কোনদিন বুড়ি হবে না রাজেশ্বরী। অন্তত আমার চোখে।

বিয়ের পর তোমরা না কি নতুন বউকে এমন কথা বলে থাকো শুনেছি। আমি তো নতুন বউ নই!

তুমি আমার পুরনো বউ।

আর বাসবী?

ও একটা ভুল।

বল বারো বছরের ভুল!

তা বলতে পার। এখন ইচ্ছে হলে তুমি দয়ালু হতে পার। ইচ্ছে হলে কঠিন।

এতদিনের ভুল তুমি শোধরাতে চাও কি করে হেমন্ত?

দু'জনেই চুপচাপ থাকল খানিকক্ষণ। তারপর একসময় রাজেশ্বীরই বলল, যদি আমাকেও ভুল মনে হয় একদিন? তখন?

একটু দয়া কর রাজেশ্বরী। তোমার পক্ষে এটুকু কিছুই না। তোমার অনেক আছে। আমার কিছু নেই। কেন কঠিন কঠিন কোশ্চেন করে বাগড়া দিচ্ছ।

তা হয় না হেমন্ত। ভীষণ দেরি হয়ে গেছে। আমি এখন আর পাকাপাকি কারও না। বলতে পার আমি দোকানদার। দোকান খুলে বসে আছি। হেমন্ত আমি শুধু খানিকক্ষণের। আমারও তো বয়স হল।

আমি খুব মন দিয়ে তোমার সেবা করবো। দেখে নিও তুমি। আমি খুব মন দিয়ে চেষ্টা করব। কোন গাফিলতি হবে না আমার দিক থেকে। তুমি শুধু একবার হ্যাঁ বলে দাও রাজেশ্বরী।

বুঝতে চাইছো না কেন? সে মন আর নেই আমার হেমন্ত। এবার ওঠো।

রাজেশ্বরী নিজেই উঠে দাঁড়াল। মাটি থেকে অনেকটা উঁচু। হেমন্তর চোখে খুব কঠিন একখানি প্রতিমা। যার কোথাও নখ বসানো যায় না। নাকের পাটায় কাঁচের কুচি। কানে সিম্পিল দুল দুলে উঠল। পায়ে থ্রি'স্ট্র্যাপের চটিতে লতাপাতার কাজ। লাল সুতোয় ফল তোলা পাড়। ওর শখের বাগানে এখনো বাতাস। কত সুন্দর—তবু কত কঠিন। এখানে দয়া নেই। ক্ষমা নেই। শান্তি চাইলেও পাওয়া যায় না।

পাখার সুইচটা বন্ধ করে দিয়ে রাজেশ্বরী ঘুরে দাঁড়াল। মাত্র ষোল কেজি ওয়েট বেড়ে গিয়ে আমার সবকিছু কেমন পালটে গেল! আশ্চর্য! আমাকে আর কোথাও অপেক্ষা করতে হয় না। শুধু মাপসই কিছু মাংস চাই আমাদের গায়ে! কি বল? তাই না! থাকলে তোমরা ছুটে আস। সবাই ছুটে আসে। আগে যদি বুঝতাম। আগে যদি জানতাম হেমন্ত। জীবনটা অন্যরকম হয়ে যেত। কবে আমি অন্যরকম হয়ে যেতাম। মাংস ভগবানের এক আশ্চর্য জিনিস!

আমি সে-দলে নই রাজেশ্বরী।

তুমিও। তুমিও। সবাই তাই। কে না?

কি করে বোঝাবো তোমাকে। আমার আর কোন ভাষা নেই। বুঝবে না বলে তুমি পণ করেছ রাজেশ্বরী। হেমন্তর ভেতরটা চাপা ভোঁতা কষ্টে ছিঁড়ে যাচ্ছিল। তবু তার সামনে কোন পথ নেই হেমন্ত জানে। এর নাম শাস্তি। এর নাম সেবা। এর নাম চেষ্টা। হবেও বা।

বাসবীকে ফিরিয়ে আনো। সুশান্ত তো তারই ছেলে।

হেমন্ত আর কোন কথা বলল না। আজ সে এসেছিল একটা বড় কাজ নিয়ে। বড় আশা নিয়ে। রাজেশ্বরী রাজি হলে তাকে বিয়ে করে নিয়ে যাবে। তাকে আর ইণ্ডিয়ান মিউজিয়ামের পাশের গলির অন্ধকারে অন্য একটা লোকের সঙ্গে প্রাণে ধরে চলে যেতে দেবে না কিছুতেই। এসবের একটা শেষ হওয়া দরকার। কাঁহাতক আর এমন লুকিয়ে লুকিয়ে খানিকক্ষণের জন্যে মিলন মিলন খেলা যায়। আমি রাজেশ্বরীর এতগুলো বছর নিয়ে কোন কোশ্চেন করব না। আমার কোন জিজ্ঞাসা নেই। আমি নতুন করে পেতে চাই। সেজন্যে মাঝের বারোটা বছর আমি মুছে দিয়েছি নিজে থেকে।

রাজেশ্বরী তাকিয়ে দেখল বারো তেরো বছর আগেকার হেমন্ত অনেক ভারি হয়েছে। চোখ কিন্তু আগেকার মতই। এখুনি সেখান থেকে জল বেরোলে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। এই সময় পুরুষলোক তাকে কঠিন ভাবে—মনে মনে অভিশাপ দিলেও দিতে পারে। এরকম কয়েকবারই তাকে কয়েকজনকে ফিরিয়ে দিতে হয়েছে। একটু মাথামাথি হলেই ওরা ভাবে—এবার বুঝি বিয়ে! কি মূর্খ! তাহলে যে আমি ফুরিয়ে যাই। শেষ হয়ে যাই। হেমন্তর গালের একপাশ বিকেলের আলোয় উজ্জ্বল—বাকিটা ঘরের অন্ধকারের সঙ্গে মিশে আছে। মাথার চুলগুলো খানিক আগে আমার কোলে মাথা ঘষে এলোমেলো করে ফেলেছে। ওরা সবাই ক'দিন মেশামিশি মাথামাখির পর আমার কোলে—বুকে কেন যে চোখ বুজে কত মাথা ঘষে—নাক

খুঁজে দেয় জানি না। বোধহয় আশ্রয় চায়। সত্যি আমি যে সামান্য। নিরুপায়! তা কি হেমন্ত একবারও ভেবে দেখবে না। আমি কোত্থেকে আশ্রয় দেব? আমিই তো খুঁজছি।

সুশান্ত তোমারও ছেলে হতে পারে।

পাগল! ও কি আমাকে কোনদিন মা বলে ডাকবে? বড়জোর বলেকয়ে মাসিমা ডাকানো যেতে পারে। এখানে একটু থামল রাজেশ্বরী। তার চেয়ে বলি কি তুমি একটা সিঙ্গিলরুমের ভালো ফ্ল্যাট খুঁজে বের কর। আমরা বেশ সেখানে যাব মাঝে মাঝে। রেস্ট নেওয়া যাবে—হটপ্লেট থাকবে—আমি খুব সুগন্ধি ভালোবাসি—

তার আর দরকার হবে না রাজেশ্বরী।

একি উঠলে? শোন। শোন। চা খেয়ে যাও এইটি—

হেমন্ত তৎক্ষণে রাস্তায়।

ছয়

রাতে অনেকদিন পরে হেমন্ত সুশান্তকে জাগন্ত অবস্থায় বিছানায় পেল। ইদানীং হেমন্ত যখন বাড়ি ফেরে—তখন সুশান্ত গভীর ঘুমে। আজ বাবাকে পেয়ে সুশান্ত বিছানায় উঠে বসল। স্নান-সারা বাবার পিঠে পাউডার মাখাতে মাখাতে বলল, আমরা কিন্তু বেশ বেড়িয়ে এলাম বাবা। তাই না?

হেমন্ত উপুড় হয়ে শুয়ে শুয়ে ভাবছিল, আমি কি করলাম। আমার সামনেও কিছু নেই। পেছনেও কিছু নেই। বর্ষাকালে কলকাতায় বন্‌ধ ডাকলে বিকেলের দিকে পথগুলো এমন হয়ে যায়। কোন গাড়ি নেই। লোক নেই। কনস্টেবল নেই। শুধু দু'খানা মেঘ ঝুলে আছে এসপ্ল্যানেডের মাথায়। রাস্তায় রাস্তায় আলো জ্বালানো হয় নি। এ কিরকম জীবন। এখনো কতদিন ধরে টানতে হবে।

সুশান্তর বড় হওয়া বাকি। আমার দেহটা পুরনো হয়ে গেল আস্তে আস্তে।

বাবা তুমি ঘুমোচ্ছ?

না তো।

আমি বলি কি মাকে নিয়ে এস।

হেমন্ত উলটে চিত হয়ে শুলো। খানিকক্ষণ ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল। কেন? তোর ইচ্ছে করে?

সুশান্ত কিছু বলল না। চুপ করে পাউডারের কৌটোটা তাকে রাখতে গেল। খাট থেকে নামার সময় ছেলের পায়ের পাতা চোখে পড়ল। কত ছোট। সুশান্ত এখনো কত ছোট। আজ বিকেলে আমি পাঞ্জাবি লড়িয়ে প্রেম করতে ছুটে ছিলাম। আমার বিবাহিতা স্ত্রী কাছেই একজনের সঙ্গে থাকে। একেবারে তার বউয়ের মত থাকে। আজই শেষরাতে আমি শালবনের শেষে কাঁদড়ের পাড়ে ছিলাম খানিকক্ষণ। সেখানে রাজেশ্বরীও ছিল।

দু'জনের ঘুমিয়ে পড়তে বেশি সময় লাগল না।

কলকাতার অন্য সব দিনের মতই খবরের কাগজগুলো বেরোতে লাগল। রোদ উঠল। এবং সন্ধ্যাও হল। রেডিওতে স্থানীয় সংবাদ। হাওড়া স্টেশনের বাথরুমে প্রচুর ব্লিচিং পাউডার। গঙ্গায় জল ও মাঠে মনুমেণ্টের কোন চেঞ্জ নেই। এর ভেতর দু'বার প্রতিজ্ঞা করে হেমন্ত সিগারেট ছাড়লো। আবার ধরল।

একদিন বিকেলের দিকে অফিসে বসে হেমন্ত যোগ দিয়ে দেখছিল, তার প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডে কত জমল।

এমন সময় ফাটা দরজা ঠেলে যে ঢুকল সে আর কেউ নয়—বাসবী।

বস। চা বলি?

বাসবী এতটা আশা করতে পারে নি। ভাবল, এটা বোধহয় তার পুরনো স্বামীর নতুন কোন ঠাট্টা। ফুটপাথে দাঁড়িয়ে এমন

হোহো করে যে লোক হেসে উঠে সব সাহস নিবিয়ে দিতে পারে—তার পক্ষে এটা কোন আশ্চর্যের ব্যাপার নয়।

আমি চা খেতে আসি নি।

তা জানি। আমার ঘর চিনে এলে কি করে? অবিনাশ কোথায়? বাইরে দাঁড়িয়ে থাকলে ডেকে আনো। আদর করে বসাই।

কেন? আমি কি পথ চিনি না। এখানেই তো—এই বাড়িতেই মিল্ক কমিশনারের অফিস থেকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট হয়েছিল।

না হলে দুধের ডিপোর দুধ আনতে গিয়ে তোমার সঙ্গে আমার আলাপই হোত না। যাক্ গিয়ে কি করতে পারি তোমার জন্যে?

কিছুই করতে হবে না। জিপ গাড়িতে কে বসেছিল মেয়েটা? সুশান্তকে নিয়ে কোথায় গিয়েছিলে তোমরা? বলতে বলতে হেমন্তকে দেখল বাসবী। দু'একটা চুল পেকেছে সিঁথিতে। দিন দুয়েকের পুরনো দাড়ি গালে। বয়স আন্দাজে বুশশার্ট একটু বেশি রঙীন।

তোমার মনে থাকার কথা নয়। দু একবার দেখে থাকবে হয়ত।

একবার দেখেছি। তুমি ওর নাম বলতে আগে খুব। রাজেশ্বরী তো!

হুঁ। তোমার মনে থাকল কি করে! সে তা অনেক আগের কথা—

তা এতকাল পরে ফিরে এলে যে—। এখানে একটু থামল বাসবী। অবশ্য তোমার পার্সোনাল ব্যাপার। আমি এসেছি সুশান্তর জন্যে।

জানতাম তুমি আসবে—

আমি মা—

ন্যাচারালি—

বাসবী যত ভেবেছিল কাঁদবে না। ঝগড়াঝাটি করবে না—দেখল ততই সেদিকে চলে যাচ্ছে। তুমি আমার স্বামী ছিলে। তুমি তো

সবই জান। আমাকে একটু দয়া কর। আমি সুশান্তকে ছেড়ে থাকতে পারব না। আদালতে গেলে তুমিই হয়ত ছেলেকে রাখার অধিকার পাবে—আমি পাব দেখার—লক্ষ্মীটি আমার কথা রাখো। আমাদের তো ঝগড়ার সম্পর্ক নয়। সুশান্ত ছাড়া আমি বাঁচবো না ওগো,—এখানে আর নিজেকে সামলাতে পারল না বাসবী। দিব্যি কাঁদতে লাগল। হেমন্ত চারদিক তাকিয়ে দেখল কেউ এখুনি না এঘরে এসে পড়ে।

আমার একটা কথা শুনবে বাসু।

পুরনো ডাকে বাসবীর চোখ আরও ভিজে উঠল। সে শুধু হেমন্তর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল।

তুমি ফিরে এস। অবিনাশকে ভুলে যাও। তখুনি যদি তোমার কথা শুনতাম—

বাসবী চোখ মুখে সোজা তাকালো। নিচেই শেয়ার মার্কেটের দাপাদাপি। বাসবী খুব আস্তে বলল, সে আর হয় না।

হেমন্ত দপ করে জ্বলে উঠল। কেন হয় না? কেন হবে না? মানুষ তো আমরা দু'জন। তুমি আর আমি। এইটুকু দু'জনে মিলে ঠিক করা যায় না?

কেন হয় না তুমি শুনতে চাও?

হেমন্ত তাকিয়ে পড়ল।

আমি মা হব।

হেমন্তর চোখের ভেতর দিয়ে অফিসপাড়ার শুকনো বাতাস বয়ে গেল। তাতে কোন ধুলো ছিল না। শুকনো অথচ গরম।

আমার পেটে এখন অবিনাশের ছেলে। আর হয় না হেমন্ত।

বাসবীর মুখে সেই বিয়ের এতকাল পরে নিজের নামটা শুনেই চমকে উঠেছিল হেমন্ত।

তখনই বাসবী বলছিল, ওগো তুমি ভেবে দেখ—আমি মা হয়ে ছেলে ছেড়ে থাকি কি করে? তুমিই বল?

হেমন্ত খানিক চুপ করে তাকিয়ে থাকল ওর দিকে। তারপর আস্তে আস্তে বলল, বেশ তাই হবে।

তুমি রাজি তো। উঃ! তুমি আমায় বাঁচালে। এতদিন আমি ঘুমোতে পারি নি। কৃতজ্ঞতায় বাসবী দু'খানা হাত এগিয়ে টেবিলের ওপারের হেমন্তর হাত দু'খানা ধরতে গেল।

হেমন্ত সরিয়ে নিয়ে বলল, যদি সুশান্ত যেতে না চায়। যদি তোমাকে ধরে রাখতে চায়? আগের বাড়িতেই।

তা আর হয় না। পাগল ছেলেকে আমি বুঝিয়ে বলব।

সব বলতে পারবে?

তা কি হয়? বাসবীর চোখ কেঁপে উঠল। এই বুঝি সব ভেস্তে যায়। খুব আলগোছে কাঁপতে কাঁপতে বলল, তাহলে আমি কখন যাব? কাল?

হ্যাঁ। এসো বিকেলের দিকে। স্কুল থেকে ফিরলে সুশান্তকে নিয়ে যাবে।

তুমি তো তখন অফিসে থাকবে।

কাল ছুটি নিচ্ছি।

ক্ষমাপ্রার্থিনীর ভঙ্গীতে বাসবী উঠে দাঁড়াল। মুখ থেকে আপনা-আপনি বেরিয়ে এল, শরীরের যত্ন নিও।

হেমন্ত মাথা তুলে গুড্ বাই করতেও ভুলে গেল। যখন চোখ তুলে তাকালো, তখন সামনের চেয়ারটা ফাঁকা।

বর্ষায় বর্ষায় অনেকদিন পরে উঠোনের কদমগাছটায় ফুল এসেছে। রাস্তার আলো দেওয়াল টপকে ভেতরে পড়তেই জায়গাটা অন্যরকম হয়ে গেল। অনেকটা বারোয়ারি পুজোর মণ্ডপ। শুধু বাজনদাররা অ্যাবসেণ্ট। প্রতিমাও নেই কোন। হামানদিস্তায় কে যেন কি পিষছে অনর্গল। হিঙের গন্ধে বাতাস ম' ম'। উঠোন-মুখো বড় ঘরটার চৌকাঠে বসে পড়ে যে মেয়েটি খুব মন দিয়ে

পাঁয়জোর বাঁধছিল—সামনেই আচমকা একটা লম্বা ছায়া দেখে উঠে দাঁড়াল।

এখানে বাসন্তী আছে? বাসন্তী। মাংস খেতে ভালবাসে খুব। মাংসের বড়া এনেছি—বাসন্তী কোথায়?

মেয়েটি ভালো করে দেখল লোকটাকে। বয়স আন্দাজে গায়ের বুশ শার্টটা একটু বেশি রঙীন। তা হোক। এমনই তো হয়। ঝোলানো। লোকটা দাঁড়াতে পারছে না দেখে মেয়েটি ছুটে ঘর থেকে একটা চেয়ার এনে দিল, সঙ্গে সঙ্গে পায়ের পাঁয়জোর বাজছিল। চেয়ারে বসে সারা উঠোনটা দেখে হেমন্তর বড় ভাল লাগল। সবুজ পাতা। তাতে এখানে ওখানে গোল গোল ঘিয়ে রঙের ফুল। মেয়েটা আসছে যাচ্ছে—পায়ে ঝুমঝুম!

বাসন্তী কোথায় গো? কোথায় গেলে? বাসন্তী?

পাশের ঘর থেকে আরও দু'টি মেয়ে ছুটে বেরিয়ে এল। কারও চুল বাঁধা হয় নি। সাজাসাজির মাঝে আসতে হল।

নাও ঠোঙাগুলো ধর। বাসন্তী—ও বাসন্তী—ছাখো—মাংসের বড়া এনেছি—গরম। দেরি করলে জুড়িয়ে যাবে যে—

মুখের সিগারেট থেকে আঝাড়া লম্বা ছাই বুক পকেটে পড়ে গেল।

দাও। বলে ওরা ঠোঙাগুলো হাতে তুলে নিল। গরম দেখছি—

তাই তো নিয়ে এলাম। বাসন্তী—ও বাসন্তী—

এই তো। আমরাই তো বাসন্তী। বলতে বলতে ওরা তিনজন একসঙ্গে হেসে হেসে ঢলে পড়ল। সেয়ানা ঢলানি। তাই একদম মাটিতে পড়ে গেল না। তখন সবুজ পাতার ভেতর ঘিয়ে রঙের গোল গোল ফুলগুলো আরও স্পষ্ট হয়ে উঠল।

অসতী

রিটায়ার করে নির্মলবাবু বাড়ি ফিরলেন বেলা চারটেয়। অফিসের ছেলেরাই ট্যাকসি ধরে দিয়েছিল। তিরিশ বছরের পুরনো পিওন জগন্নাথ ট্যাকসি থেকে পেছন পেছন নামল। হাতে চৌধুরীবাবুর ফেয়ারওয়েলের প্রাইজ। ফ্ল্যাকস্, এক সেট কলম, জগদীশবাবুর গীতা—এসব জিনিসকে সে প্রাইজ বলে জানে। এর সঙ্গে এক-প্লেট মিষ্টি দেওয়া হয়ে থাকে। আজও দেওয়া হয়েছিল। নির্মল চৌধুরী পানতুয়াটা তুলে নিয়ে বাকি প্লেটটা তার দিকেই এগিয়ে দিয়েছে। বড়বাবু কোনদিনই মিষ্টি বিশেষ পছন্দ করেন না। জগন্নাথ ক্যাশ সেকসনে বদলি হয়ে ইস্তক আজ বিশ বছর চৌধুরী মশাইয়ের অভ্যেস জানে। বেলা এগারোটায় এক গ্লাস জল ও খয়ের ছাড়া এক খিলি পান। দেড়টায় চিনি ছাড়া এক কাপ চা—সঙ্গে একখানা মরিচ টোস্ট। বেলা তিনটেয় আবার এক গ্লাস জল ও এক খিলি পান। ব্যাস্। সদর সাপ্লাই অফিসের বড়বাবুর এই হল গিয়ে নিত্য অভ্যেস। এর ভেতরে সিমেণ্ট কিংবা লোহা চাইতে এসে পার্টি যে মিষ্টি বা এটা ওটা ভেতরে পাঠাতো না—তা নয়। তবে বড়বাবুর টেবিল অবধি সেসব কোনদিন পৌঁছায় নি। দামী সিগারেট এলে অফিসারের টেবিলে যেত। খাবার-দাবার ছেলেমেয়েদের ভেতরেই বাঁটোয়ারা হয়ে যেত।

তবে, একটা কথা। জগন্নাথ হলপ করে বলতে পারে। সে নিজে নাম সইয়ের বেশি কিছু জানে না। কিন্তু বড়বাবুর কলম যে খুব ধারালো। তা সে জানে। পার্টিদের গলতি থাকলে বড়বাবু এমন শুধরে দেবে—তাতে সিমেণ্ট হোক, লোহা হোক—স্যাংশন না হয়ে যায় না। সেজন্য চৌধুরী মশাই নিত্যদিন পান খাওয়ার পয়সা পেতেন। জগন্নাথের হাত দিয়ে।

আপসোস। এবার সেটা বন্ধ হয়ে গেল। নতুন বড়বাবু কে আসবে কে জানে। কি এমনটি হবেন! হলেও চৌধুরী মশাইয়ের মত সেও কি রোজ তাকে দু'টাকা তিনটাকা পান খাওয়ার পয়সা পাইয়ে দেবেন? ব্যাপারটা চিন্তার কথা। বিশেষত এই বাজারে।

একটা আশার আলো বড়বাবু দিয়েছেন তাকে। বলেছেন, কোন চিন্তা করিসনে জগন্নাথ। পাঁচ ছেলেমেয়ের বাপ আমি। বাড়ি ভাড়াই দু'শো টাকা। আমার তো ঘরে বসে থাকলে চলবে না। সামনের সোমবার থেকে অফিসের সামনে বসে আমাকেও খাতা লিখতে হবে। পারমিটের অ্যাপলিকেশন আমাকে দিয়েই সাবেক পার্টিগুলো লেখাবে। তুই সেসব অফিসারের টেবিলে পৌঁছে দিয়ে পয়সা পাবি। চিন্তা কি তোর।

বাড়িতে পা দিয়ে আশালতার মুখ দেখে নির্মল চৌধুরী দমে গেল। আশালতা তার বত্রিশ বছরের পুরনো বউ। গরমের দুপুর বলে জামা গায়ে দেয় নি। মেঝেতে ঘুমিয়ে ছিল। ট্যাকসি চলে যাওয়ার শব্দে ধড়মড় করে উঠে বসেছে।

জগন্নাথটা কিছু না খেয়ে দোরগোড়া থেকে চলে গেল। মনটা খচখচ করতে করতেই বউকে বলল, নাও ধর!

বিপিন পাল রোডে এখন এই ভাড়ায় ঘর আর পাওয়া যায় না। বাড়িওয়ালা বুড়ো। নয়ত নির্মল চৌধুরীকে ওঠানোর চেষ্টা করত। বাতব্যাধির পুরনো রোগী। শার্টটা খুলে হ্যাঙারে ঝুলিয়ে দিল।

এ মা! গীতা দিয়েছে কেন?

বাঃ! বুড়ো হলাম না আমরা? এবার তো এইসব পড়তে হবে। মন সুস্থির করতে হবে।

আমরা তো বুড়ো হই নি।

লোকে তা মানবে না। রিটায়ার হয়ে গেলে সবাই বুড়ো বলে। তোমাকে অবশ্য বুড়ি বলতে আটকাবে লোকের—

একটা শব্দহীন ঝামটা দিয়ে আশালতা ভেতরের ঘরে আঙুল

দেখিয়ে বলল, নন্দা ঘুমোচ্ছে। রাজা এখুনি কলেজ থেকে ফিরবে। পাখাটা ছেড়ে দিয়ে সদ্য রিটায়ার করা স্বামীর জন্যে চা করে আনতে গেল।

নির্মল চৌধুরী পাখাটা বন্ধ করে দিয়ে বসল। জানালা দিয়েই হাওয়া আসছে বেশ। পাখার দরকার কি। এখন খরচ কমিয়ে চলতে হবে তাকে। পরপর দু'মেয়ে। ছন্দা, নন্দা। বড়টার বিয়ে হয়ে গেছে। তার শাশুড়ি সাক্ষাৎ খাণ্ডারণী। পালটি ঘর হিসাবে নির্মলের অবস্থা তত ভাল নয় বলে মেয়েকে বাপের বাড়ি বিশেষ যেতে দেয় না।

নন্দা এবার সংস্কৃতে এম এ দিয়েছে। মাঝে মাঝে চাকরি খোঁজে। হয় না।

তারপর গৌতম।

তার ছবি এখন টেবিলে। নির্মল চৌধুরীর বুকের ভেতরে মোচড় দিয়ে উঠল।

গৌতমের পরে আরও তিন ছেলে। রাণা, রাজা, বিলটু!

রাণা বি এ পাস করে ল পড়ছে।

রাজা বি এস সি পার্ট টু পরীক্ষা দেবে।

বিলটু ক্লাস সেভেন।

পড়ার খরচই গুচ্ছের টাকা। নন্দার বিয়ে দিতে দমদমায় কেনা চারকাঠা জমি বেচতে হবে। তার খদ্দের ধরা দরকার। আজকাল আবার লোনে জমি কিনতে চায় না। নাহলে ক'বছর আগেও সস্তায় কেনা জায়গাটুকু দাম উঠেছিল বেশ চড়া।

বাড়িভাড়া, রেশন, বাজার, ইলেকট্রিক, ধোপা, স্কুল, কলেজ, মাসকাবারি, গাড়িভাড়া কোত্থেকে আসবে? ভাবলে মাথা ঘুরে যায়। এর মধ্যে বড় মেয়ে, জামাইও আসে মাঝে মাঝে। মোটর পার্টসের ব্যবসা আছে। বড় মেয়েটা খারাপ নেই।

আশালতা চায়ের কাপটা নামিয়ে দিয়ে মেঝেতে বসল। নির্মল

সবে এক চুমুক দিয়েছে। তখন দেখল আশালতার চোখ দিয়ে টপটপ করে জল পড়ছে।

কি ব্যাপার ?

আশালতা আঁচলের খুঁট দিয়ে চোখ মুছে বলল, তোমার মেয়ে বিয়ে করে এসেছে।

কি বললে ? টেবিলের ঢাকনায় কিছু চা পড়ে গেল।

নন্দা পৃথ্বীশকে বিয়ে করেছে। এক মাস হয়ে গেল।

চা ঠাণ্ডা হতে লাগল। একবার জানালো না ?

বাপ হয়ে পাছে তুমি বাধা দাও। তাই সাত তাড়াতাড়ি কাগজের বিয়ে সেরে এসেছে। বিয়ের জন্যে মেয়ে তোমার পাগল হয়ে উঠেছিল।

কিছু না বলে আশালতাকে দেখল নির্মল। এ সব কি বলছে ? মেয়ের ওপর রাগ করে মুখে যা আসছিল তাই বলে যাচ্ছিল আশা। একসময় উঠে গিয়ে পাশের ঘরে দাঁড়াল নির্মল। পাশ ফিরে ঘুমোচ্ছে মেয়েটা। বাঁ চোখের নিচে একটা মোটা শিরা ফুলে আছে। ভীষণ ক্লান্ত। অবেলায় ঘরে আলো নেই বিশেষ। ময়লা চাদর। ময়লা বালিশ। মশারি কাচা দরকার।

মাত্র ছাব্বিশ বছর আগে এই মেয়েটা হওয়ার সময় মনে কত আনন্দ ছিল। এ মাসে বেড কভার কিনলে পরের মাসে ক্যালিকো নেটের মশারি কেনার বাজেট করত অনেক আগে থেকে। সে সব দিন কোথায় চলে গেল। দিনগুলো শুধু পিছলে যাবার জন্যেই আসে।

বাবা ? তুমি ? ধড়মড় করে উঠে বসল নন্দা।

ঘুমো।

নন্দা খাট থেকে নেমে পড়ল। লম্বা ঝুলে পড়া চুলের গোছা বিড়ে পাকিয়ে মাথায় তুলে নিল। সামনের জানালা দিয়ে বস্তির মাঠ দেখা যায়। পাশেই মানসিক আশ্রম। নড়বড়ে দোতলা

বাড়িটায় কে বা কারা পাগল পোষার ব্যবসা খুলেছে। একজন পেসেণ্ট তারই দিকে তাকিয়ে। নন্দা মুখ ফেরালো না। পাশেই বাবা দাঁড়িয়ে। বাবা তাকে জানে। চেনে। এ রাস্তায় বাড়িগুলোর গায়ে কোথাও বা শ্যাওলা—কোথাও মাধবীলতা—আসল কথা একটা পুরনো স্মৃতি মাখানো রঙ-চটা কাঠের রেলিং—বর্ষার জল বের করতে প্রায় বাড়িতেই পোড়া মাটির পাইপ—তাই বোধহয় এ পাড়ায় খুব ধুমধামে দুর্গাপুজো হয়—বিজয়ার দিন থিয়েটার। সেই থিয়েটার দেখতে গিয়ে তো পৃথ্বীশের সঙ্গে পরিচয় ঘন হল। আলাপ করিয়ে দিয়েছিল দোতলার খুশিদি।

মা মোটে দেখতে পারে না খুশিদিকে। বলে, দু'দুটো ছেলের সঙ্গে স্বামীস্ত্রীর মত থেকে শেষমেশ ল্যাং খেল। এখন ভালো ভালো মেয়ে দেখলে তাদের বুলিয়ে না দিতে পারলে ওর শান্তি নেই।

মা যে কত বাজে কথা বলতে পারে। মা কিন্তু এমন ছিল না। এই ক'মাসে কত যে খারাপ কথা মাকে বলতে হল। এখন এই মুহূর্তে মায়ের জন্য মনটা ভার হয়ে এল নন্দার। মা তো জানে না—খুশিদি কত দুখী।

রীতেশকে আমি কি বলব?

খট্ করে ঘুরে তাকালো নন্দা। বাবা তার দিকে পরিষ্কার তাকিয়ে। ক'মাস আগে হলে নন্দাও এমন সোজাসুজি বাবার চোখে চোখে তাকাতে পারত না।

বাবা অনেক বুড়ো হয়ে গেছে। একটু ঝুঁকে দাঁড়ানো। পৃথিবী সোজা ছিল বলে বেহিসেবির মত আগে আগে আন্দাজে আনন্দে বাবা হয়েছেন কয়েকবার। তারপর সেই আনন্দ সামলাতে গিয়ে মাপা বেতনের বড়বাবু নির্মল চৌধুরীকে অমানুষিক পরিশ্রম করতে হয়েছে গত বিশ বছর। তার ছাপ তো থাকবেই।

সে আমি বুঝবো বাবা। তুমি চা খাবে?

এই তো খেলাম।

মাথাটা আঁচড়ে সামনের ঘরে যেতেই মায়ের মুখোমুখি পড়ে গেল। ফিরে আসছিল। পারল না।

কোথায় যাচ্ছিস? বস। এমন করে মুখ হাসালি কেন আমাদের? খবরটা আজই সকালে জানতে পেরেছে আশালতা। জেনে ইস্তক সে আর এক জায়গায় বসতে পারছে না। সব সময় কি করি—কি করি ভাব। এ আমার কি হল।

নন্দা খিঁচিয়ে উঠল। আর ন্যাকামো কোরো না।

শোনো মেয়ের কথা! তোর জন্যে রীতেশের মত ডাক্তার ছেলে যোগাড় হল। তুই শেষে ওই লোফারকে গলায় ঝোলালি!

মুখ সামলে কথা বলবে মা। কে লোফার? ইংরাজি অনার্স নিয়ে বি, এ পাস।

সার্টিফিকেট দেখিয়েছে তোকে?

হ্যাঁ। দেখিয়েছে। তোমার মত শাশুড়ি যার—সে জামাইকে তো সার্টিফিকেট দেখাতেই হবে!

বলেও কষ্ট হল নন্দার। কি অপমান! কি অপমান! সার্টিফিকেট দেখাতে বলে যা লজ্জা পেয়েছিল নন্দা তা বলার নয়। পৃথ্বীশ কিন্তু কিছু বলে নি। শুধু বলেছে, আমি তোমায় বিয়ে না করলে বাঁচব না। ছেলেরা যে কি করে এমন কথা বলে তা ও বুঝতে পারে না। গোড়ায় গোড়ায় রীতেশও এমন বলত।

সার্টিফিকেট দেখিয়ে পৃথ্বীশ আরও বলেছে, তখন বাবা না মারা গেলে আমি ইংরাজি নিয়ে এম, এ পড়তাম। পড়া হল না। ব্যাংকে ঢুকে পড়লাম। দাদুর আমলের বাড়ি সারাতে পারি নি আমরা। ছোট ভাই দু'টোকে পড়াতে হল। নইলে পরীক্ষা দিয়ে এতদিনে আমি অফিসার হয়ে যেতাম। তোমার মায়ের অফিসার জামাই আমার স্বপ্ন পূর্ণ হত।

খুব লজ্জা পেয়েছে নন্দা। খুব লজ্জা। এসব ভাবতে ওর বোধহয় সব মিলিয়ে আড়াই সেকেণ্ডও লাগে নি। তার ভেতরই

আশালতা বলল, কে শাশুড়ি? আমি না। আমি না। বলতে বলতে কেঁদেই ফেলল আশালতা।

অত বড় চুল রাখে মাথায়। খুশির মতলবে পড়ে তুই ওকে বিয়ে করলি। পৃথ্বীশের বয়স হয়েছে। হুঁশিয়ারি বুদ্ধি ধরে মাথায়। সেই তোকে ভুলিয়ে ভালিয়ে বিয়ে করল। আমি কি ভালো ছেলে তোর জন্যে ঠিক করেছিলাম। তুই বুঝলি না।

ছেলেমানুষের মত কেঁদো না। পৃথ্বীশের বয়স এখন পঁয়ত্রিশ।

পঁয়ত্রিশ ছিল তিন বছর আগে।

সে তো তুমি বলবেই। মাথায় চুল রেখেছে—থিয়েটার করে বলে। ওদের নাটকের দল আছে।

ভালো নাটক দেখালি!

আমি খুকি নই। তোমার রাতেশের মাথায় তো টাক পড়তে বসতে বাকি নেই। বলতে বলতে হাসি এসে গেল নন্দার। এবার মা কি বলছে। এরকমভাবে হিসেব করে বললে তো শেষে বলতে হয়—রাতেশের একটি মাথা ও দুটি চোখ আছে—হাত ও পা দু'খানি করে এবং নাক একখানি। অবশ্য প্রথম আলাপের সময় রাতেশের মাথায় বেশ অনেকটা চুল ছিল। রাত জেগে জেগে অ্যানাটমির প্রিপারেশন আর টনসিলের সিমপ্টম মুখস্থ করে মাথার চুল পাতলা হয়ে এল। দিল্লীতে এম ডি পড়তে যাওয়ার আগেও ওর কপাল এতটা ফাঁকা দেখাতো না। ভালো ছেলে! কি আমার ভালো ছেলেরে!

অফিসার, ইনজিনিয়ার, ডাক্তার, আই এ এস না হলে তোমার পছন্দ হয় না। তোমার মামার বাড়ি থেকে এসব পেয়েছ।

আশালতা ছোটবেলায় মামাবাড়িতেই বড় হয়েছে। মামার অবস্থা ভালো। মামা নিয়ে খোটা দিলে আশালতা চুপ করে থাকতে পারে না। তবু নিজেকে সংযত করে খুব আস্তে বলল, তোর ভালোর জন্যই তো—

তাই বলে এই মাস কয়েক আগেও তো তুমি এক এস ডি ও কে হাজির করেছিলে—

ভালো ছেলে পেলে আনবো না? তোকে ছেলেটির পছন্দ হয়েছিল। নিজে থেকেই এগিয়ে এসেছিল।

আলাপ হল না। পরিচয় হল না। পছন্দ হয়ে গেল। বা! বেশ!

তোর মত আলাপি তো সবাই নয়।

দেখ মা বাজে কথা বলবে না। একদম বলবে না।

ওমা! আমি কি বলব! রীতেশের সঙ্গে কত বেড়ালি। একসঙ্গে সিনেমা রেস্তোরাঁ করলি কত চোখে দেখলাম—পিওন কত চিঠি দিয়ে গেল।

সব জেনেশুনে তুমি যদি মা খারাপ অর্থ কর—আমি আর কথাই বলব না মা তোমার সঙ্গে। রীতেশ শিলচরে তার বাবার কাছে গিয়ে একবারও বলতে পারত—বাবা আমি একজন গরীব হেডক্লার্কের মেয়েকে বিয়ে করব? বল তুমি? রীতেশ কোনদিনই পরিষ্কার করে বলতে পারত না—কবে সে আমাকে বিয়ে করবে।

আগামী ফাল্গুনেই বিয়ে করত।

তোমায় বলেছে?

হ্যাঁ। তোর বাবাকেও বলে গেছে। শিলচরে তার বাবাকে গিয়ে সব বলে মত নিয়ে আসতে গেছে।

ভালো কথা। আমি আমার ঘটা-বিয়ে নিজের হাতে ভেঙে দিই তাহলে? কেন? না রীতেশ এতকাল পরে তার বাবার মত আনতে গেছে! মরে যাই!

তুই আর ছ'টা মাস অপেক্ষা করে দেখতিস—বেশি তো নয়—মোটে ছ'মাস। গৌতম গেল। সংসারের এই অবস্থা। তুই আর ছ'মাস দেখতে পারলিনে? এত ক্ষেপে গেলি বিয়ের জন্যে?

নির্মল ঘরে এসে ঢুকতেই মা ও মেয়ে চুপ করে গেল।

॥ দুই ॥

বছর কুড়ি আগে নির্মল চৌধুরীর একটি ছেলে হয়েছিল। পর পর দু'মেয়ের পর প্রথম ছেলে। তার পরে অবশ্য আরও তিনটি ছেলে হয়।

প্রথম ছেলের নাম গৌতম। পড়াশুনোয় ভালো। গান গায় হাসি খুশি। বাপ মায়ের দুঃখ খুব বুঝতো। স্কলারশিপ নিয়ে শিবপুরে বি ই পড়ছিল। সেখানে একটি হসটেল ছিল ফার্স্ট ইয়ার, সেকেণ্ড ইয়ারের ছাত্রদের জন্যে। আর একটি থার্ড ইয়ার, ফোর্থ ইয়ারের জন্য। থার্ড ইয়ারে উঠে নতুন হসটেলে গেল। সেখানে যারা থাকে তাদের কেউ কেউ যে নিশ্চিত মৃত্যুদূত তা ও ঘুণাক্ষরেও বুঝতে পারে নি। বিশেষত যে ছেলে গান গায়, ফার্স্ট হয়, এক্সকারসনে যায়—তার এসব দিকে আদৌ মাথা খোলে না।

অবিশ্বাস, গুপ্তহত্যা তখন অনেক জায়গায় ছড়িয়ে পড়েছিল। উগ্র এবং অধিক উগ্র দু'দল ছেলে এই দুই হসটেলের নানান ঘরে ছড়িয়ে পড়েছিল। তখন চেয়ারম্যানের দিন। 'যুগ যুগ জিও' প্রায় মার্চিং সং। সেই সময় একপক্ষ সন্দেহ করল—গৌতম বুঝি তাদের কথা আরেক পক্ষকে ফাঁস করে দিয়েছে। গৌতম আদপেই কিছু জানত না। তার জানার কথাও নয়। স্রেফ সন্দেহ।

কিংবা এই বোধহয় নিয়ম ছিল তখন—নিষ্পাপ ভালো ছেলেটাকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিয়ে বাকিদের মনে ভয় ধরিয়ে দাও। তাহলেই প্ল্যান মত স্কুল কলেজ বন্ধ হয়ে যাবে।

ইত্যাদি ইত্যাদি। বেলা দু'টোয় হসটেলে একটা ফোন এসেছিল। ফোর্থ ইয়ারের অনুপ ফোন ধরে। গৌতম ব্যানার্জী আছে? বলা দরকার—নির্মলবাবুর চৌধুরী পদবীর আড়ালে আদত পদবী ছিল ব্যানার্জী। বিয়ের পর আশালতা স্বামীর পদবী চৌধুরী রেখে দিয়েই

—ছেলেমেয়েদের ব্যানার্জী করে দিয়েছিল। নাহলে ওরা যে ব্রাহ্মণ চৌধুরী—সেকথা নাকি ধরা পড়ছিল না।

ফোন পেয়েই বেরিয়ে যায় গৌতম।

শীতকাল সন্ধ্যে সওয়া পাঁচটা। টালিগঞ্জ ট্রাম ডিপোর কাছে গ্রাহামস্‌ল্যাণ্ড। গৌতমের জন্ম-পাড়া। বিয়ের পর দশ বছর নির্মল চৌধুরী সেখানে ছিলেন। রাস্তার মোড়ে আলো নিভিয়ে দিয়ে ওরা ওয়েট করছিল।

প্রথমে লোহার রড। তারপর সাইকেলের চেন ও ভোজালি।

গৌতম ছুটে গিয়ে একটা বাড়ির দরজায় ধাক্কা মেরেছিল। কেউ খোলে নি। তারপর পাশের বাড়িতে গিয়েও দরজায় ধাক্কা দিয়েছিল। কেউ খোলে নি। সারাটা পাড়া চুপ। অন্ধ। বোবা বধির মাথা দিয়ে রক্ত গড়িয়ে পিঠ ভিজে গিয়েছিল। সাইকেলের চেনের এক চাবুকে বাঁ হাঁটুটা গুঁড়ো হয়ে গেছে।

বাঙ্গুর হাসপাতালে নিয়ে যেতে যেতে গৌতম মারা যায়। খবর পেয়ে আশালতা, নির্মল ছুটে যায়। আশার সন্দেহ হাসপাতালের ভিড়ের ভেতর তখনো খুনীদের কেউ কেউ ছিল। কেননা কেউ কেউ তখনো বার বার জানতে চাইছিল—গৌতম সত্যিই মারা গিয়েছে কি না? না গেলেই তো বিপদ। কারণ মরবার আগে গৌতম অস্পষ্ট দুএকটা নাম বলেছিল। আশালতা কাছে থাকলে ঠিক বুঝতে পারতো—কার কার নাম গৌতম বলতে চাইছে। কিন্তু পরিচিতজন শেষ সময়ে কেউই কাছে ছিল না গৌতমের।

নন্দা খুব অবাক হয়ে গিয়েছিল। কেওড়াতলার ইলেকট্রিক শ্মশানে কিউ দিয়ে যখন সময় হল—তখন ওর জানা কয়েকজন ক্লাসফ্রেণ্ড গৌতমের চারধারে দাঁড়িয়ে একসঙ্গে গম্ভীর গলায় সুর করে বলল—কমরেড্ তোমায় ভুলি নি—ভুলব না কোনদিন। এ আঘাতের পাল্টা আঘাত দেব। জিন্দাবাদ!

নন্দা কাঁদতে কাঁদতে চমকে থেমে গিয়েছিল। দূরে মা একটানা

কান্নার ভেতর কেঁদে চলেছে। আস্তে, গুনগুন করে। খুশিদি নন্দাকে ধরে দাঁড়িয়ে ছিল। আমার ভাই তো কোনদিকে ছিল না। তোমরা তো আবেগের মাথায় এই শপথ কোরাস করে বললে। শ্মশানের বাইরে গিয়েই সবাই ভুলে যাবে। আমরা আমাদের ভাইকে আর কোনদিন ফিরে পাব না।

রীতেশের সঙ্গে বিকেলে বেড়াতে বেরিয়ে একদিন একজনকে দেখেই নন্দা চিনতে পেরেছিল। গৌতমের সিনিয়র রুমমেট। দিব্য পাস করেও গেছে এতদিনে। হয়তো কোথাও এখন ইরিগেশনের অ্যাসিস্ট্যান্ট ইনজিনিয়ার। অবশ্য যদি চাকরি পেয়ে থাকে। নিশ্চয় পেয়েছে। যা ধুরন্ধর! সব জানতো ছেলেটা। ও-ই গৌতমকে ফোন করে ডেকে নিয়েছিল। কিন্তু প্রমাণ নেই কোন। পুলিশও বিশেষ এগোলো না। এই সমাজে আমাদের কোন জোর নেই। কত সুশ্রী ছেলে দিব্যি বিদেশে পড়তে চলে গেল। তাদের বাবাদের পয়সা ছিল। আমাদের নেই। আমার ভাই গেল। কোন দোষ না করে।

ছেলেটাকে শ্মশানেও দেখেছিল বোধহয়। অনেক ছেলের ভিড়ে মিশে ছিল। নামটা মনে নেই ঠিক। রীতেশকে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছিল।

বাদ দাও নন্দা। যা গেছে তা তো আর ফিরে আসবে না।

দিল্লী যাবে রীতেশ। কালকা মেল সন্ধ্যে সাড়ে সাতটায়। সকালের ফ্লাইটে শিলচর থেকে দমদমে এসে নেমেছে। আর আধঘণ্টা পরেই ট্যাকসি নিয়ে হাওড়া চলে যাবে। দিল্লীতে এম, ডি পড়তে যাওয়ার পর থেকেই দেখাসাক্ষাৎ ওদের এরকমই চলছিল কিছুদিন ধরে!

নন্দা শাড়িতে পেন্সিল দিয়ে লতাপাতা এঁকেছে। নকশা তুলবে। রীতেশের ফাস্ট কলারের টিউব কিনে দেওয়ার কথা। অর্থাৎ উপহার।

নন্দা আচমকা ফিরে গেল। বলল, থাক। দরকার নেই।

কি'হল? কিনবে বললে—

আজ থাক। শরীরটা ভালো লাগছে না।

লেক মার্কেটের সামনে রীতেশ দাঁড়িয়ে পড়ল। পথে ভিড়। নিওন আলো। ফুটপাথে কলাপাতায় গোড়ের মালা ছড়িয়ে বিক্রি হচ্ছে। ট্রেনের এখনো ঘণ্টা দেড়েক বাকি। এই ট্যাকসি—গলির মোড়ে এসে নন্দা দেখল, দরজা খোলা পেয়ে দু'জন পাগল বেরিয়ে পড়েছে। পাড়ার ছেলেরা তাদের নিয়ে মজা করছে। একজনের গালে দাড়ি। সে চিবুকে হাত দিয়ে সোজা দাঁড়িয়ে ইংরাজি বলছে। অন্যজন অদৃশ্য কলের নিচে দাঁড়িয়ে অদৃশ্য জলে পা ঘষে ঘষে ধুয়ে যাচ্ছে। অদৃশ্য কল বন্ধ করছে। খুলছে। পাজামা তুলে ধরেছে—পাছে ভিজে যায়। আহা! গৌতম যদি পাগল হয়েও বেঁচে থাকত আজ!

ফিরে এলি এত তাড়াতাড়ি।

এমনি। মাকে বিশেষ কিছু আর বলল না। তার আজ নিজেকে অপরাধী লেগেছে। গৌতম নেই। আমি সেজেগুজে রীতেশের সঙ্গে বেড়াতে বেরিয়েছি। সেজেছি ভেবেই এত লজ্জা লাগল। নিজের ওপর ঘেন্না হল।

মুখে বলল, কি আমার মানসিক আশ্রম রে! রেখেছে তো পাগলদের পেয়িং গেস্ট করে। ব্যবসা। স্রেফ ব্যবসা। তাও যদি ভালো করে রাখত। দরজা খোলা পেয়ে দু'জন বেরিয়ে পড়েছে—

তুই ফিরে এলি যে বড়। রীতেশ কিছু বলল? মেয়ে বড় হয়ে ইস্তক আশালতা সাবধানে কথা বলে। বিশেষত ছন্দার বিয়ের পর থেকে। তার বড় মেয়েটা ছোটর তুলনায় অনেক নরম ছিল।

মায়ের এই হ্যাংলামি নন্দার একদম ভালো লাগে না। রীতেশ কি কিছু ভালো কথা, হাসি, সদ্ব্যবহার দান করে এই মহিলার মুখে হাসি ফোটাতে চায়? মাকে নন্দা আজ কিছু বলতে পারল না।

বলার কিছু ছিল না। তার মানে একটা সন্দেহ দেখা দিয়েছে। রীতেশ কয়েক মাস অন্তর দিল্লী থেকে শিলচর যাওয়া আসার পথে কয়েক ঘণ্টার জন্যে কলকাতায় থাকে। তখন তাকে কিছু কিছু ভালো কথা বলে। কিন্তু আসল কথা বলে না। আমার তো বয়স হচ্ছে। আচমকা উঠে দাঁড়িয়ে পাশের ঘরে আয়নার সামনে গেল। চোখের নিচে সামান্য দাগ ধরেছে। মাথার চুল বেশ বড়। মুখ একটুও টসকায় নি। বুকের ওপর থেকে চোখ সরিয়ে নিল এক সেকেণ্ড।

খুশিদির সঙ্গে লেকটেম্পেল রোডে এক বিয়ের নেমন্তন্নে গিয়ে রীতেশের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। রীতেশ চক্রবর্তী। ওরা তিন পুরুষের ওপর আসামে আছে। কলকাতার সঙ্গে ওর বাবার ওষুধের ব্যবসা। তাই ছোট ছেলে রীতেশকে ডাক্তারী পড়াচ্ছেন। এম, বি, বি. এস করেও থামে নি রীতেশ। দিল্লীর মৌলানা আজাদ মেডিক্যাল কলেজে পোস্ট গ্রাজুয়েট ডিগ্রি করছে আজ বছর দশেক। কলকাতায় ক্লিক বলে চান্স পায় নি। অন্তত রীতেশের কথায় তাই মনে হয়েছে তার। যখন আলাপ—তখন রীতেশ থার্ড ইয়ারের স্টুডেন্ট। একবার ওর বাবা মা কলকাতায় এলে রীতেশ নন্দাকে নিয়ে গিয়ে দেখিয়েছিল। কলেজের বারান্দায়। বিকেলবেলা। ছেলেকে দেখতে এসে ওঁরা জানলেন, সেকেণ্ড ইয়ারের স্টুডেন্ট নন্দা ব্যানার্জী ওদের ছেলের বন্ধু। নন্দা প্রণাম করে নি। হাত তুলে নমস্কার করেছিল। জায়গাটা প্রণাম করার মত ছিল না। হাজার হোক কাছেই আউটডোর। পেসেন্টদের লাইন।

তারপর অনেকবার ওর কলেজে গেছে নন্দা। পাস করার পর হাসপাতালে। ওরা দু'জনে স্বপ্নে ভেসেছে অনেকদিন। রীতেশ দিনের আলোয় স্বপ্নের কথা অসম্ভব ভালো করে সাজিয়ে বলতে পারে। যেমন আমাদের বিয়ের পর প্রথম তিনমাস আমরা রোজ বেরিয়ে পড়ব। ক্ষিধে পেলে বাইরে খেয়ে নেব। ইত্যাদি। ইত্যাদি।

কিন্তু বিয়ের কথাটাই বলে না। আসলে কবে? আর কতদিন পরে?

ঘরের জানালা দিয়ে সারাটা পাড়া দেখা যায়। মানসিক আশ্রমের দোতলা বাড়িটার গা দিয়ে একটা আধা পিচের রাস্তা লখার মাঠের দিকে চলে গেছে। সেখানে এখন আর মাঠ নেই। অনেক বাড়ি। করপোরেশনের একটা মরা পার্ক পড়ে আছে। ওখানে নাকি আগে একটা খারাপ পাড়া ছিল। সন্ধ্যে হলে হ্যাজাক বাতি জ্বলত। সেখানে গরীব রিকশাওয়ালা, মিস্ত্রী, মাঝে মাঝে কেরানীবাবুরাও নাকি আসতেন। খুশিদি একদিন দুপুরে বলেছিলেন ওর জন্ম এ-পাড়ায়।

রাণী এখুনি ইউনিভার্সিটি থেকে ফিরবে। রাজা খেলতে বেরিয়েছে। বিল্টু দুধে পাউরুটি ভিজিয়ে আছে। গৌতমের ছবিতে মা ধূপকাঠি ধরিয়ে লাগিয়ে দিয়েছে। কলকাতা কলকাতার জায়গাতেই আছে। শুধু গৌতম নেই।

শাড়ি, জামা কিছুই পাল্টালো না নন্দা। মাঝের ঘরে গিয়ে উপুড় হয়ে শুয়ে কাঁদতে লাগল। তার পিঠোপিঠি ভাই গৌতম আর কোনদিন ফিরবে না। ছোটবেলায় নন্দা তাকে আদর করে ডাকতো —ছোটভাই। ওই নামে ডাকলে গৌতম হাত তুলে সাড়া দিত। নন্দা মনে মনে দু'বার ডাকলো—ভাই।

পিঠে হাত পড়তে মুখ তুলে তাকালো। দোতলার খুশিদি। বি, এ পাস করে আর পড়ে নি। দুধের ডিপোয় কাজ পেয়েছিল। করে নি। এই বয়সেও মাঝে মধ্যে দু'একদিন জোড়া বেণী করে চুল বেঁধে পথে বেরোয়। এটা ওটা কেনে। চটি খটাস খটাস করে হাঁটে। সায়ার লেশ ঝুলে পড়লেও খেয়াল থাকে না। এক একদিন সঙ্গে বেরিয়ে নন্দা ভীষণ বকেঝকে ওঠে—কি হচ্ছে খুশিদি? হেসে বলবে, তুই বুঝবি নে। নন্দা সব বোঝে না। শুধু বোঝে, খুশিদির গভীর কোন একটা কষ্ট আছে। সে কষ্টের কোন মলম দোকানে কিনতে পাওয়া যায় না।

ভর-সন্ধ্যে বেলায় ঘুমোচ্ছিস যে। চল বেড়িয়ে আসবি।

তুমি যাও খুশিদি। আমি বেরোবো না।

ঘুরে আসবি চল। একা একা বেরোনো যায়?

পথে বেরিয়ে দেখল, খুশিদি একা নয়। দেশপ্রিয় পার্কের ওখানে এক ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে ছিলেন। ঢোলা ট্রাউজার। মাথার চুল কিছু দীর্ঘ। গায়ের রং রোদে পুড়ে প্রায় কালোর কাছাকাছি। বয়স বত্রিশ হতে পারে। আবার উনচল্লিশ হওয়াও আশ্চর্য নয়।

পৃথ্বীশবাবু যে? কি মনে করে?

ত্যাগরাজ হলের একটা ডেট নিতে এসেছিলাম। পাওয়া গেল না। সামনের মাসে ট্রুপের একটা 'শো' করতেই হবে।

রীতেশের ট্রেন বোধ হয় এতক্ষণে হাওড়া ছাড়ল। জানালার কাছে সিট পেয়েছে। রাতে একটা চাদর গায়ে জড়িয়ে নিতে বলেছিল নন্দা। আজকাল তো কালকা মেল অনেকটা ইলেকট্রিকে যায়। কয়লার গুঁড়ো চোখে পড়ার ভয় নেই।

খুশিদি যে কত নতুন নতুন লোকের সঙ্গে কথা বলে। খুশিদিই রীতেশের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছিল। লেক টেম্পেল রোডে এক বিয়ে বাড়িতে। খেয়ে উঠে স্লিপার খুঁজে পাচ্ছিল না নন্দা। রীতেশ তখন খুব লাজুক ছিল।

শোন্ নন্দা। একে চিনিস?

নন্দা মাথা নাড়ল।

অলীকবাবুতে অলীকবাবু যদুবংশে গণাদা। উত্তরের ব্যালকনিতে হিরো। ওঃ! সরি! তুই তো আবার থিয়েটার দেখিস না। দুর্দান্ত অ্যাকটর। না দেখলে বুঝতে পারবি নে—

এই তো একটু একটু দেখেই বুঝছি!

ভদ্রলোক রীতিমত নার্ভাস হয়ে নন্দার দিকে তাকালো। তারপর খুশিদির দিকে। অত উপরে তুলে দেবেন না। পড়ে গিয়ে হাত পা ভাঙবে। আমার নাম পৃথ্বীশ দত্ত। আমাদের ট্রুপের নাম শুনে

থাকবেন—'পাদপ্রদীপ'। আমি পাদপ্রদীপের ফাউনডার ভাইস্-প্রেসিডেন্ট! নমস্কারের ভঙ্গী থেকে জোড়হাত খুলে ফেলল পৃথ্বীশ।

আমি নন্দা ব্যানার্জী। তারপর হেসে বলল, আপনি ফাউণ্ডার—কিন্তু তাহলে 'পাদপ্রদীপের' প্রেসিডেন্ট না হয়ে ভাইস-প্রেসিডেন্ট হলেন ?

শুনবেন ? তবে চলুন মাঠে বসি।

ঘাসের উপর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে গিয়ে ওরা তিনজনে টেনিস কোর্টের উল্টোদিকে গিয়ে বসল। আমি তো চাকরি করি। ইনক্রিমেণ্ট আছে—ডি এ আছে. কিন্তু আমাদের তন্ময়দার সেসব কিছু নেই। আগে কোন্ থিয়েটারে মোশন মাস্টার ছিলেন। বহুদিনের ঝোক—একটা থিয়েটারের দল খোলেন। নতুন নাটক অভিনয় করতে হবে। চাকরি নেই কোন পাকা। অর্ডার সাপ্লাইয়ের কাজ করেন সারাদিন। সন্ধ্যেবেলা এসে রিহার্সালে বসবেন। পাইকপাড়ার বাসায় ফিরবেন সেই রাত এগারোটায়। এমন লোককে বাদ দিয়ে আমি প্রেসিডেন্ট হই কি করে বলুন ? আপনি হতে পারবেন ?

আমি ? আমি! আমি কেন হতে যাব ? নন্দা অবাক হয়ে আঁচলটা গলা অব্দি টেনে নিল। পৃথ্বীশের বাঁ গালে পার্কের ওধারের নিওন শ্লাইড্ একবার নীল আরেকবার লাল আলো ফেলছিল। ডান কানটা অন্ধকারে। নাকের একদিক খাড়াই দেওয়াল হয়ে মুখের ওপর উঠে আছে। পৃথ্বীশ দত্ত রিহার্সাল দিচ্ছে ? না, এইভাবেই কথা বলে ? যা বলতে চায়—তা বেশ ঝোঁক দিয়েই বলে। কথায় অনেকখানি বিশ্বাস ঢেলে দেয়। মাথার চুলে নিওনের লাল আলো পড়ে মাঝে মাঝেই আগুন ধরে যাচ্ছিল।

আমরা তো মানুষকে পুরোপুরি বদলাতে পারি না। খানিকক্ষণের জন্যে পারি। সুখ, দুঃখ, ভয়, ঘৃণা—এই চারিটি বল নিয়ে মঞ্চে লোকসৃষ্টি করি। তবে এই বলগুলো অদৃশ্য।

নন্দা দেখল, পৃথ্বীশ যেখানে বসেছে—তার আশেপাশে অনেকটা

জায়গা জুড়ে ঘাস পুড়ে গিয়েছে। লোকটার গা দিয়ে কেমন একটা ভ্যাপসা গরম বেরোয়। খুশিদি মুগ্ধ হয়ে শুনছে। চোখ খুলে দেখল, পৃথ্বীশ তারই দিকে তাকিয়ে কথা বলে যাচ্ছে। কথাগুলো নন্দার কানে গেল না। চোখ নামিয়ে নিল। হাজার হোক সে একজন মেয়ে। এই দৃষ্টি সে চেনে। খুশিদির পক্ষে আর দুঃখ পাওয়া ঠিক হবে না।

আমরা কি জন্যে এই পৃথিবীতে এলাম বলতে পারেন মিস্ ব্যানার্জী ?

আমার নাম নন্দা।

জানি। বলতে পারেন, কেন শুধু শুধু বেঁচে থেকে একদিন ফুরিয়ে যায় ? আমি দেশ জয় করতে পারব না। নতুন নদী আবিষ্কারের আর চান্স নেই। বারুদ আবিষ্কার হয়ে গেছে। বাইসাইকেল এখন মফঃস্বলে আশ্রয় নিয়েছে। নিয়তি বলুন—প্রকৃতি বলুন—আমাদের জন্যে শুধু একটি সোনার খনিই বাকি রেখেছেন।

খুশি আর নন্দা এক সঙ্গে তাকিয়ে পড়ল।

তা এই মন। বুকে হাত রেখে পৃথ্বীশ বলল, এখানকার কথাই আমি নানাভাবে অভিনয়ে বলতে চাই। আমার ভাবনা মানুষে সঞ্চারিত করতে চাই। কমুনিকেশন আমার আসল কথা—

নন্দা মজা করে বলল, আপনার কোনটা অভিনয় ? কোনটা মনের কথা ? আমরা সাধারণ মানুষ বুঝবো কি করে বলুন ?

হাঁটতে হাঁটতে ওরা তিনজনে ফুটপাথে এসে দাঁড়াল। নন্দা আড়চোখে দেখল, খুশিদির ঘোর তখনো কাটে নি। আচ্ছন্ন পায়ে ভিড়ের রাস্তা দিয়ে পাশাপাশি হেঁটে চলেছে। বিনুনীতে ফুল দিয়েছে। ওমা ! এতক্ষণ তো দেখি নি।

সবসময় তো মানুষ অভিনয় করে না। বলেই নিজেকে কারেক্ট করে পৃথ্বীশ আবার বলল, বোধহয় সবসময়ই আমরা অভিনয় করি। তাই না ? বলে হেসে ফেলল।

কলকাতার পথে ঠিক এইসময় কিছু বকুলগাছ বাতাস পেয়ে শুকনো ফুল ঝরিয়ে দেয় ফুটপাথে। পথচারীদের ভেতর নন্দার গায়েও পড়ল। রাস্তায় ঝরে যাওয়ার আগে একটা ফুল নন্দা মুঠোয় ধরে ফেলল। গন্ধটা আলগোছে নাকের কাছে নিয়ে খুব ভালো লাগলো।

ইহাই কলিকাতা।

॥ তিন ॥

পাঠক।

আপনার প্রতি অবিচার হয়েছে সবচেয়ে বেশী। গোড়াতেই আমি একটা ভুল করে বসেছি। অন্য সব কাহিনীর মতই আমি এখানেও একেবারে গোড়ায় গল্পের ভেতর ঢুকে যাই। সেটা উচিত হয় নি। কেনন এ-কাহিনী একটু অন্য রকম।

এ গল্প যাদের নিয়ে—তারা কেমন আদৌ বলা হয় নি। বিশেষত নন্দার কথা কিছু বলা দরকার।

আশালতার দ্বিতীয় সন্তান নন্দা। পেটে থাকতে ওর মা কিছু ক্যালসিয়াম ইঞ্জেকসন নিয়েছিল। নির্মল চৌধুরী দ্বিতীয় মেয়ের বেলায় আর খাড়াতে পেরেছিল। ফলে সংসারে কিছু সুরাহা হয়।

সেই সময় থেকেই মেয়েটিকে ওরা সংসারের লক্ষ্মী বলেই ভেবে আসছিল। খুবই পয়মন্ত। নন্দাও দিনে দিনে সুন্দরী হয়ে ওঠে। গ্রাহামস্ল্যাণ্ডের বাসা ছাড়ার আগে নন্দাকে দেখে সে মস্তানদের মুণ্ডু ঘুরে যায়। তাই নিয়ে প্রলয়ঙ্কর মারামারি একদিন। তারপরেই তো নির্মল চৌধুরী বিপিন পাল রোডে উঠে আসে।

সেই সময়েই টেরিকটের শাড়ি বাজারে বেরোয়। এবং নন্দা

পাকাপাকি শাড়ি ধরে। চোখে মুখে একটু অবুঝভঙ্গী, ছোট কপাল, নাক সামান্য চাপা, উজ্জ্বল চোখ—সব কথাতেই একটা হাসি ভঙ্গী—কলেজে থাকতেই নন্দাকে পপুলার করে তোলে। তাছাড়া ওর কিছু পছন্দ অপছন্দ ছিল। ঘুম থেকে উঠে ভোরের কাগজটা পড়ে ফেলত। দিদির হারমোনিয়ামটা টেনে নিয়ে কোন কোনদিন সকালবেলা দু' তিনখানা গান গেয়ে ফেলত। আলাদা একটা শাড়ি—আলাদা একটা ভঙ্গী ওকে সব সময়েই নতুন করে রাখত। এক শুধু গায়ের রং কিছু চাপা। তবু ওকেই কো-এডুকেশন কলেজে ক্লাসের ছেলেরা ঘুরে ফিরে তাকিয়ে দেখত।

নন্দা তা জানত। তাই কোনদিন বিশেষ গা করে নি।

বিয়ে বাড়ির সন্ধ্যায় আলো ঝলমল বার-বাড়িতে, ফুটপাথের সাজানো ডেকরেটরের চেয়ারে বসে থাকা লোকজন, মহিলারা অবশ্যই খানিকক্ষণের জন্যে সুন্দর হয়ে ওঠে। খোঁপায় ফুল, মানুষজনের হাতে সিগারেটের আস্ত প্যাকেট, কেউ বা জামায় একটু বেশী সেণ্ট ঢেলে ফেলেছে—বাতাসে সুগন্ধি।

রাত আটটাও বাজে নি। একতলার বড় ঘরটায় বিবাহবাসর। সেখান থেকে কে একজনের হাত ধরে বেরিয়ে এসে খুশিদি ডাকতে লাগল। নন্দা শুনে যা। আলাপ করিয়ে দিই—

সনৎবাবু নামে কে এক ভদ্রলোক অনেকদিন ধরে খুশিদির সঙ্গে মেশামেশ করার পর দিব্যি কেটে পড়েছে সবে। ভদ্রলোককে নন্দা কোনদিন সামনাসামনি দেখে নি। যেদিন ছুটে গেছে দেখতে—সনৎবাবু তখন রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছে। মাথার পেছনে পাগড়ি হাঁটার চালে একটু একটু দুলতো। লোকটা কমারসিয়াল জিওগ্রাফি পড়তো কোন্ কলেজে। প্রিভেণ্টিভ অফিসের চাকরি পেয়ে সেই যে কেটে পড়লো। শোনা যায় খুশিদিকে ছেড়ে দু'মাসের ভেতর বিয়ে করেছে।

তারপর মাস ছয়েক খুশিদি একদম বেরোয় নি। অল্পদিন হল

বেরোচ্ছে। এখন যদি নন্দা ওকে এতখানি আনন্দের ভেতর আচমকা আঘাত করে তবে খুশিদি নিশ্চয় ভেঙে পড়বে। মানুষ কি একজন সঙ্গীর জন্যেই বড় হয়? সুন্দরী হয়? যৌবন কার জন্য আসে তবে?

রীতেশকে তুই দেখিস নি আগে। ভারি ভালো ওরা—

খুশিদির চোখে সবাই ভালো। এমন কি সেই সনৎবাবু লোকটাও নাকি ভালো ছিল। কেটে পড়ার পর খুশিদিই তাকে বলেছিল। পুরনো প্রেমপত্রগুলো পোড়াবার সময়।

নন্দা কোন কথা বলল না। শুধু হাসল। ছেলেরা সামান্য কালো হলে তার দেখতে ভালো লাগে। তারপর যদি মুখে হাসি থাকে তো কথাই নেই।

চলুন না আপনাদের সঙ্গে ট্রাম লাইন অব্দি যাই। দিদির এখনো বেরোতে দেরি হবে।

আগে আগে যাচ্ছিল রীতেশ। পেছনে নন্দার পাশে খুশিদি।

আমি ওর দিদির ক্লাসফ্রেণ্ড ছিলাম নন্দা। ওরা শিলচরের লোক। ভীষণ ভালো।

ভালো, ভালো শুনে গায়ে জ্বালা ধরে যায় নন্দার। খুব আস্তে বলল, আপনি ফিরে যান। এই তো কাছেই বাড়ি—

রীতেশ অনেকটা হেসে বলল, আমিও তো ফিরে যাব হস্টেলে। দেওর এসে দিদিকে নিয়ে যাবে।

তোকে বলি নি নন্দা। রীতেশের এম, বি, বি, এস থার্ড ইয়ার যাচ্ছে—

নন্দার খুব অবাক লাগল। এই তো সবে আলাপ হল। এখুনি ফর্দ দিতে হবে?

আমাদের শিলচরে এখন ঠাণ্ডা পড়ে গেছে। এই সময় আমরা র‍্যাপার জড়াই গায়ে।

আহা! কতদিন পরে র‍্যাপার কথাটা শুনলো নন্দা। বোধহয় নতুন জুতো পরেছে ছেলেটা। কেমন মচমচ শব্দ হচ্ছে হাঁটার সঙ্গে সঙ্গে।

এগিয়ে দিতে এসে রীতেশ একদম ওদের বাড়ি অব্দি চলে এল। আশালতা বারান্দায় বসে ছিল। রীতেশকে কোনদিন দেখে নি আগে। তবু যে কেন বলতে গেল, সিঁড়িতে উঠে ফিরে যেও না বাবা। দু'মিনিট বসে এক কাপ কফি খেয়ে যাও।

রীতেশকে বসিয়ে জল চাপিয়ে অবাক হল নন্দা। মা তো খুব মডার্ন হয়ে গেছে। খুশিদি কথা বলার বিশেষ চান্স পেল না। নন্দা কফির কাপ ধরিয়ে দিতে রীতেশ দিব্যি তুলে নিল। যাবার সময় আশালতা বলল, তোমাদের আউটডোরে নন্দাকে একটু দেখিয়ে দিতে পার?

নন্দা তো অবাক।

ওর একটা কান ছোটবেলায় ঠিক মত বেঁধানো হয় নি। দুল পরতে গিয়ে লাগে বাবা।

নন্দা ভেঙিয়ে উঠলো। লাগে বাবা!

কাল চলে আসুন ই এন টি-তে।

কাটাকুটি করবেন না তো!

দেখুন না কি করি!

আমি যাচ্ছি না।

টেরও পাবেন না। অ্যানাসথেসিয়া দিয়ে কাজ হবে। কালই তো ই এন টি-র ডেট আছে। চলে আসুন আটটার ভেতর। আমি ওয়েট করব।

পরদিন সকালে সিকোয়েন্স ছিল অল্পক্ষণের। পুরো ই এন টি যেন নন্দার জন্যে তৈরি হয়েই ছিল। বড় ডাক্তারকে রীতেশ শুধু বলল, আমার রিলেটিভ্ স্যার—

তারপর চুলের ঢাল সরিয়ে কানে লোকাল অ্যানাসথেসিয়া দিতে দিতে বলল, এত সুন্দর জিনিস সর্বক্ষণ কেন ঢেকে রাখেন বলুন তো?

আঃ! কান টানছেন কেন বলুন তো? ছাড়ুন।

সামনেই সিনিয়র দাঁড়িয়ে ছল। রীতেশ আস্তে বলল, অ্যানাসথেসিয়া দিতেও দেবেন না—

রীতেশের আহত মুখখানা দেখে পরিবেশ বুঝে নন্দা চুপ করে গেল। তারই ভেতর রীতেশ কুটুস করে কানের লতিতে কি ফুটিয়ে দিয়ে বলল, হয়ে গেছে। ব্যাস্—এত অস্থির না আপনি—

এরই কিছুদিনের ভেতর নন্দা জানতে পারল, হাসপাতাল নামক অপদার্থ জায়গাটাকেও মাঝে মাঝে খুবই সুন্দর লাগে। সেখান থেকে স্টেথেসকোপ হাতে রীতেশ যখন বেরিয়ে আসত—নন্দার মাঝে মাঝে অপরাধী লাগত নিজেকে—একটা কাজের জায়গা থেকে একজন দরকারী মানুষকে এমনভাবে বের করে আনা তার পক্ষে ঠিক হচ্ছে না।

কিন্তু কি করবে? এমন করে দোতলায় খুশিদির বাবার ঘরে টেলিফোন করত। চলে এস। নয় ত পারব না। আমি মরে যাচ্ছি। এটসেটরা।

পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে কতদিন নন্দাকে বলেছে, তুমি ঠিক তোমার জায়গাতে নেই কিন্তু। নন্দা শুধু অবাক হয়ে তাকাত। ভাবত, আমার জায়গা ঠিক কোথায়।

রীতেশের সঙ্গে ঘুরে ফিরে এক একদিন বাড়ি ফিরে জানালায় বসে মানসিক আশ্রমের দিকে তাকিয়ে থাকত।

একটা বয়সে জীবন একদম রেসের ঘোড়া। একদম পড়িমরি করে ছোটে। তখনকার ছবিগুলো সব একে একে দেখতে পাচ্ছিল নন্দা। দেড় বছর পি আর সি থাকার পর রীতেশ চক্রবর্তী এম বি বি এস একদিন দিল্লী চলে গেল। এম ডি পড়বে।

ততদিন রীতেশ অনেক উদাসীন হয়ে পড়েছে। ভালোবাসার কথাগুলো বলতে বলতে পুরনো হয়ে গেল একদিন। মাঝে মাঝে নন্দার খুব কষ্ট হত। কিন্তু কিছু বলতে পারত না। শেষদিকে উপহার নাড়াচাড়াও শেষ হয়ে গেল। চিঠি বন্ধ হয়ে গেল।

লজ্জার মাথা খেয়ে নন্দা একবার লিখেছিল: রীতেশ—তুমি এবার একটা কিছু ঠিক কর।

তোমার পড়াশুনো কবে শেষ হবে জানি না। তুমি কবে নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে মনোমত আয় করবে তাও আমি জানি না। শুধু জানি আমি ফুরিয়ে যাচ্ছি।

মিষ্টি কথায় বোঝাই মামুলি একটা জবাব এসেছিল শুধু। তুমি অফুরন্ত। ফুরবার নয়। তার সঙ্গে আরও কিছু কিছু ভালো কথা ছিল। কয়েকটি স্বপ্নের কথাও ছিল। যেমন, বিয়ের পরে রীতেশ নন্দাকে নিয়ে কোথায় যাবে। ইত্যাদি সাত পুরনো।

তারপর অনেকদিন কোন চিঠি নেই। নন্দা না লিখলে জবাব আসে না। গৌতম নেই। নেই বলতে একদম নেই। আচমকা একদিন রীতেশ এল। শিলচর চলে গেল। ফেরার পথে দিল্লী যাওয়ার আগে রীতেশ এসেছিল। গৌতমের কথা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে শুনেছিল। বিকেলের দিকে বেড়াতে বেরিয়ে নন্দা মন খারাপ করে বাড়ি ফিরে আসে। তার ছোট ভাই আর নেই। উগ্র আন্দোলন নিবে গেল। সব শান্ত হল। কিন্তু গৌতম কোনদিন ফিরবে না। নিজেকে বড় অপরাধী লেগেছিল। অন্যবার রীতেশকে হাওড়া স্টেশন অব্দি এগিয়ে দেয়। এবার আর দেওয়া হল না।

বাড়ি ফিরে বিছানায় উপুড় হয়ে কাঁদছিল। খুশিদি নিয়ে গেল বেড়াতে। বেড়াতে গিয়ে পৃথ্বীশের সঙ্গে আলাপ।

শীতের মুখে মুখে আবার পৃথ্বীশের সঙ্গে দেখা হল নন্দার। এবার নন্দাই এগিয়ে গিয়ে আলাপ করল। সন্ধ্যেবেলা রাসবিহারীর মোড়ে উলের কাঁটা কিনতে এসেছিল। ফেরার পথে দেখল, মুক্তাঙ্গনে 'অলীকবাবু।'

কোনদিন যা করে না—তাই করল আজ। মাংসের গরম গরম চপ কিনলো দু'টো। তারপর দু'টাকার একখানা টিকিট। অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল। শো আরম্ভ হবে হবে। সিট খুঁজে বসতেই যাকে

স্টেজে পেল সে সেই পৃথ্বীশ। ওয়াণ্ডার ফুল অ্যাকটিং। হাসাতে হাসাতে সবাইকে কাহিল করে তুলেছে। ধরা পড়েও পর পর মিথ্যা কথা বলে যাচ্ছে। অডিয়ান্স পেট ফেটে হাসছে। নন্দাও হাসছিল। কি অদ্ভুত ক্ষমতা পৃথ্বীশের।

শো শেষ হলে নন্দা নিজেই পেছন দিক দিয়ে সাজঘরে এগিয়ে গেল। পৃথ্বীশ তখনো মাথা থেকে উইগ খোলে নি। মেয়েরা বড় ডানার পাখা ঘুরিয়ে হাওয়া খাচ্ছিল। নন্দাকে দেখে তো পৃথ্বীশ অস্থির। সাজঘরের সিংহাসন প্যাটার্নের একটা চেয়ার এগিয়ে দিল। তাতে পিঠের কাছে ভেলভেট। বসতে খুব অস্বস্তি লাগছিল নন্দার। এমন প্রধান অতিথির ট্রিটমেণ্টে নার্ভাস হয়ে পড়ছিল। যে শ্বশুর সেজেছিল—তাকে ডাকলো পৃথ্বীশ—ও তন্ময়দা। দেখে যান। কে এসেছে এই সেই নন্দা—

ভদ্রলোক দাড়ি খুলতে খুলতে এগিয়ে এলেন।

নন্দা পৃথ্বীশকে বলল, কেন? আমার কথা কি বলেছেন ওঁকে?

পৃথ্বীশ নিজের আনন্দে ছিল। তন্ময়দাকে বলল, এই মেয়েটিই জানতে চেয়েছিল আমি প্রেসিডেণ্ট না হয়ে আপনি কেন 'পাদপ্রদীপের' প্রেসিডেণ্ট?

ওমা! তাও মনে করে রেখেছেন! নন্দা লজ্জা পেল। আমি কিছু ভেবে বলি নি।

পৃথ্বীশ বললে, না না সেজন্যে নয়। তন্ময়দাকে ডেকে আপনাকে দেখালাম। আপনি তো তন্ময়দাকে আগে কখনো দেখেন নি। এঁর জন্যেই আমাদের অ্যাসোসিয়েসন টিকে আছে।

নন্দা খানিক পরে বেরিয়ে এল।

তারপর মাঝে মাঝেই পৃথ্বীশের সঙ্গে ওর দেখা হতে লাগল। কখনো চন্দ্রমাধব রোড়ে পাদপ্রদীপের অফিসে। কখনো ভবানীপুরে ওদের বাড়ির মোড়ে। আবার কখনো পার্ক স্ট্রীটে স্টেট ব্যাংকের ব্রাঞ্চে—লাঞ্চের সময়। হলারিথ সেকসন থেকে পৃথ্বীশ বেরিয়ে

আসত। একগাদা অঙ্কের ভেতর থেকে উঠে এসে নন্দাকে তার এই ট্র্যাফিক সিগন্যাল, গানবাজনাওয়ালা রেস্তোরাঁর স্টেটম্যান আই বি এমের স্কাইস্কেপারের পাশে একেবারে আনকোরা, টাটকা লাগত। পাশেই একটা নতুন হোটেল। নাম—দিনরাত।

নন্দা সংস্কৃতে হাই সেকেণ্ড ক্লাস পেল। কিন্তু কলকাতায় কোথাও কোন স্কুলে কিছু পেল না। লাঞ্চটাইমে পৃথ্বীশকে বের করে নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে ক্যাভেণ্টারের দোকানে গেল। সেখানে কোল্ড মিল্কে স্ট্র ডুবিয়ে নন্দাই বলল, ডিপার্টমেণ্টাল পরীক্ষা দিয়ে তোমার অফিসার হতে বাধা কোথায়?

কোন বাধা নেই নন্দা। কিন্তু আমি অফিসার হব না দু'টো কারণে।

নন্দা অবাক হয়ে তাকালো। কেন?

এক। তোমার মা অফিসার জামাই না হলে তার সঙ্গে তোমার বিয়ে দেবেন না। আমি না—তাই। এই অবস্থায় যদি তুমি আমায় বিয়ে করতে রাজি থাকো তো ভালো। নয়ত নয়। আর তোমার মায়ের পছন্দ মাফিক আমি অফিসার হওয়ার জন্যে উঠে পড়ে লাগতে পারব না। সেটা আমার পক্ষে অপমানের—

দু' নম্বর কারণ?

সেটা আরও অনেক বড় ব্যাপার—

শুনিই না।

অফিসার হলেই বদলি করবে। ট্রেনিংয়ে পাঠাবে। তখন আরও প্রোমোশনের ইচ্ছে হবে আমার।

খারাপ কি? ভালোই তো। .৩ ম্যারেজ

না। তাহলে তন্ময়দা একা ক্লাব চালাতে

ভেঙে যাবে। একেবারে কালই?

তমি কি সংবন্দী—

কিন্তু সাক্ষী কোথায় আছে তোমার?

আমি অভিনয় করতে চাই। ভালো নাটক করতে চাই নন্দা। সেজন্যে আমাকে দরকার হলে অনেক কিছু ছাড়তে হবে। সেজন্যে আমি তৈরি—

তাহলে আমাকেই ছাড়ো আগে।

আমি তো ধরে রাখি নি নন্দা। তুমি নিজে ভেবে দেখ। শুধু বিয়ের জন্যে আমি বিয়ে করতে পারব না।

কিন্তু আমি কি করি বলতো। মা তো আশা করে আছে—রীতেশ। নয় তো কোন অফিসার। নিজে কেরানী বিয়ে করেছিল বলে অফিসার ওঁর কাছে স্বপ্ন। আর তাতে নাকি আমি সুখে থাকব।

রীতেশবাবু তো ভালো পাত্র। ডাক্তার। সব মা চায়—তার মেয়ে ভালো ছেলে বিয়ে করুক। তুমি আপত্তি করছো কেন?

নন্দা কিছু বলতে পারল না। কোল্ডমিল্ক খাওয়া হয়ে গিয়েছিল। গটগট করে উঠে গিয়ে কাউণ্টারে দাম দিল। তারপর সেই শীতেই ফুটপাথে নেমে পড়ল।

সঙ্গে সঙ্গে পৃথ্বীশ একদৌড়ে ওর পাশাপাশি গিয়ে হাঁটতে লাগল। ভুল বুঝলে নন্দা।

আর ন্যাকামো করতে হবে না। তুমি অফিসে যাও এখন। আমি বাড়ি যাব।

যাবেই তো। তবে অতদূর থেকে ঠেঙিয়ে এতখানি এলে কেন?

লিণ্ডসে স্ট্রীট থেকে ট্রাম লাইনে এসে নন্দা মুখ খুললো। রীতেশ চিঠি লিখেছে।

ভালো কথা।

-- বেড়ানো, চিঠি লেখালিখি—আরও অনেক কিছুর দিব্যি

- ওর জন্যে পঁচাত্তর সাল অবধি ওয়েট করি।

ডাক্তারকে। তুমি রেডি থাকলেই আমি রেডি। যদি বল কালই রাজি। ব্যাকডেটের অ্যাপলিকেশন দিয়ে কাল সব চুকিয়ে ফেলি। কি বল।

নন্দা চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিল। একটা টু বি চলে গেল। একদম ফাঁকা। তাতে একটি নতুন বউ জানলার ধারে রয়েছে। পাশেই নতুন স্বামী। নন্দা পৃথ্বীশের দিকে ফিরে বলল, খুশিদির উপরেও মা চটেছে।

আহা! ওর তো কোন দোষ নেই। পৃথ্বীশ আর কিছু বলতে পারল না। সে জানে খুশি তার জন্যে একবার মরেছিল। শুধু বয়সে ছোট সঙ্গী নন্দার জন্যে আপসে সরে দাঁড়িয়েছে। নন্দাও তা জানে। তবু তাকে বলতে হল, সত্যি কথাই বলতে হল, মা তোমাকে দেখেছে। তোমাকে তাঁর একদম পছন্দ নয়।

আস্তে আস্তে পছন্দ হবে। আগে জামাই হই। কিছুক্ষণ থেমে থেকে পৃথ্বীশ নিজেই বলল, মানুষকে ধৈর্য ধরতে হয়। আমি না হয় ধরব।

শাশুড়ি উপাখ্যান নিয়ে কি একটা নাটক ছিল মলিয়রের—জ্যোতি ঠাকুর বাংলায় করে গেছেন—আঃ! কিছুতেই নামটা মনে পড়ছে না। তুমি পড়েছো?

নন্দা রুখে দাঁড়াল। ভালো হবে না কিন্তু বলে দিচ্ছি। আমার মাকে নিয়ে ইয়াকি আমি সহ্য করব না।

চটে যাচ্ছ কেন! আমি নাটকের কথা বলছি তো—

হ্যাঁ ওই পর্যন্ত।

তাহলে সেটেল্ড। কাজ বেলা দশটায়। ওয়েলেসলিতে ম্যারেজ রেজিস্টারের ওখানে।

নন্দা আকাশ থেকে পড়ল। একেবারে কালই?

হ্যাঁ কালকেই।

কিন্তু সাক্ষী কোথায় আছে তোমার?

পৃথ্বীশ বলল, লাগবে তো তিনজন। আমি দু'জন আনব। তুমি একজন এনো।

নন্দা বলল, আমি কোথায় সাক্ষী পাব? এক যদি খুশিদি আসে।

হ্যাট উইল বি টু ক্রুয়েল। কেন তোমার সেই তপু কাকা?

হ্যাঁ। তাকে বলতে পারি।

রাতের দিকে নন্দার ভালো করে ঘুম হল না। তপু কাকাকে রাজি করিয়েছে সাক্ষী দিতে। তার চেয়ে বছর পাঁচেকের বড় জ্ঞাতি কাকা। কলেজে পাড়ায়। টিচার্স ফেডারেশনের একটা কেউকেটা। মাঝে মাঝে কাগজে নাম ওঠে।

সব ঠিকঠাক করে সন্ধ্যেবেলা বাড়ি ঢুকতেই মা হাসিমুখে রিসিভ করল, একটা পোস্টকার্ড এসেছে তোর। রীতেশ এ মাসের মাঝামাঝি কোলকাতায় আসবে।

আমার চিঠি তুমি পড়লে কেন?

পোস্টকার্ডে লেখা। ওইটুকু শুধু চোখে পড়ল।

আশালতার হাসি হাসি মুখখানা আর কড়া কথা বলে অন্ধকার করে দিতে ইচ্ছে হল না নন্দার। বড় আশা করে আছে—ডাক্তার জামাই হবে। সবাই ঘর থেকে সরে যেতে—না পড়েই পোস্টকার্ড-খানা জানলা গলিয়ে বাইরে ফেলে দিয়েছে।

আশালতা ইদানীং সকাল সকাল শুয়ে পড়ে। রাণা, রাজা, বিলটু পড়ছিল। নিজেই একসময় উঠে গিয়ে রাত দশটা নাগাত নন্দা জানলার নিচ থেকে পোস্টকার্ডখানা খুঁজে কুড়িয়ে নিয়ে এসেছে।

রাজা একবার বলেছিল, কোথায় যাচ্ছিস দিদি?

তোর দরকার কিরে! চেঁচিয়ে পড়া মুখস্থ কর।

বাইরে এসে বারান্দায় বসে লাইটপোস্টের আলোয় রীতেশের

চিঠিখানা পড়েছে নন্দা। কোন ভাবান্তর হয় নি তার। মামুলি চিঠি। তাও পোস্টকার্ডে। অনেকদিন নন্দার কোন চিঠি না পেয়ে নিশ্চিন্ত স্বামীর ঢঙে লেখা। আমি কলকাতা হইয়া শিলচর যাইব। ফেরার পথে এইবার দুইদিন কলকাতায় থাকিব। স্নেহাশিস্ নিও। ইতি তোমাদের রীতেশ।

নন্দার একবারও মনে হল না, বিশেষ কারও চিঠি পড়ছে সে। এ যেন পুরনো বাক্স ঘেঁটে অনাত্মীয় অপরিচিত কারও রিডাইরেক্ট করা পোস্টকার্ড পাওয়া গেছে।

কিন্তু বিছানায় শুয়ে শুয়ে কিছুতেই ঘুম এল না। তারপর একসময় দেখল একটা অজানা রাস্তা দিয়ে হাঁটছে। বোধহয় মফস্বল জায়গা। খোয়া ওঠা রাস্তার একধারে পুকুর—উলটো দিকে জামা-কাপড়ের দোকান। সেখান থেকে সোয়েটার, জাম্পার, পুলওভার, ভেস্ট—নানা রঙের উলের জিনিস ছুঁড়ে ছুঁড়ে পুকুরে ফেলা হচ্ছে। কেউ বাধা দিচ্ছে না। সোয়েটারগুলো ভিজে গিয়ে ভেসে আছে। সে পথ হাঁটতে গিয়ে অনেক গাছপালা পড়ল। তারপর একটা বিরাট লম্বা ঘর—তার লাগোয়া দরদালান। পরিষ্কার আলোয় সেখানে নানা বয়সের মেয়ে পুরুষ থাকে ইংরাজিতে বলে রিক্লাইনিং পোজিশনে—মেঝেতে বসে আছে—কেউ কেউ শুয়ে আছে। কারো গায়ে এক টুকরো সুতোও নেই। সেজন্যে কোন লাজ লজ্জার বালাই নেই। সবাই যেন গল্প করছে। কোন পুরনো কথা নিয়ে আলাপ হচ্ছে। সবারই গায়ের চামড়া লালচে, অনেকগুলো লাল শরীর আলোর নিচে। নন্দা মনে করতে চাইল, এই বারান্দা দরদালান আগে সে কোথায় দেখেছে? কোথায় দেখেছে? অনেক কষ্টে মনে পড়ল, গৌতমকে পোড়াতে গিয়ে ভুল করে কাঠের চিতার পুরনো এলাকায় ঢুকে পড়েছিল। সেখানে সনাতন হিন্দু মতের সৎকারীদের একটা দল ওরকম ধোঁয়া মাখানো ঘর, দরদালানে বসেছিল। ওরা তবে কারা? চিতায় চড়ানোর আগে পৃথিবীর জামা-কাপড় খুলে ফেলে

একখানি শ্বেতবস্ত্রে সারা শরীর ঢাকা দেওয়া হয়। আগুনের প্রথম চোটেই তা জ্বলে যায়। তারপর শরীরখানা কাঠ আর আগুনে সরাসরি মাখামাখি হয়ে যায়। তখন একেবারে লাল হয়ে যায় শরীর। এরা তবে কারা ? কাদের সঙ্গে দেখা হল আমার ? গৌতম ? তুই এদের সঙ্গে আমার দেখা করিয়ে দিলি।

পরদিন বেলা এগারোটায় পাদপ্রদীপের লাইফ প্রেসিডেন্ট তন্ময়দা ভাইস-প্রেসিডেন্ট পৃথ্বীশ দত্তের কাগজের বিয়েতে সই দিলেন। পাত্রী নন্দা ব্যানার্জী। তার তপু কাকাও সই দিল।

আর যেন কে সই দিয়েছিল—তা মনে নেই এখন নন্দার। পৃথ্বীশ একটা হাতঘড়ি আর একখানা তাঁতের শাড়ি এনেছিল। ওদের ট্যাকসিতে তুলে দিয়ে তন্ময়দা তপুকাকাকে নিয়ে ট্রামে ওঠার আগে বলে গেলেন, পারলে, একটু গঙ্গার ধারটা ঘুরে যাস।

সেদিনই প্রথম ময়দানের কাছাকাছি—আকাশবাণী ভবন ফেলে পেছনে পৃথ্বীশ নন্দাকে চুমো খায়।

নন্দা তখনই বলেছিল, ব্রীতেশ কিন্তু চিঠি দিয়েছে।

এখন যে যা ইচ্ছে দিক। আমি আর কাউকে ভয় করি না।

খুব সাহস বেড়েছে দেখছি।

তুমি সঙ্গে থাকলে তো বাড়বেই।

বাড়ি ফিরে কিন্তু সেদিনই নন্দা আশালতাকে কিছু বলতে পারে নি। এমনকি খুশিদিকেও বলে নি। অথচ সেদিন থেকে সে—শ্রীমতী নন্দা দত্ত।

॥ চার ॥

ক'দিন হল নির্মল চৌধুরী সাপ্লাই অফিসে গিয়ে পার্টিদের কাগজ-পত্র রেডি করে দিচ্ছে। রিটায়ার করে কাজে বেরোনো—কেমন যেন নতুন চাকরির মতো। খাটছেও বেশি। আরও আশ্চর্যের কথা—এখন যেন মাইনের চেয়ে বেশি পয়সা আসছে। তাই নির্মল খাটছেও খুব বেশি। না খেটে উপায় নেই। কাজের ভেতর থাকলে গৌতমকে ভুলে থাকা যায়। রীতেশের সঙ্গে বিয়ে না হয়ে পৃথ্বীশ নামে কে একটা ছেলেকে নন্দা আচমকা বিয়ে করে বসে আছে—সেকথাও ভুলে থাকা যায়।

বাড়ি ঢুকে দেখল, সামনের ঘরে রীতেশ বসে আছে। নির্মল আর কি বলবে। থাক থাক। বসো। বলে ভেতরের ঘরে গেল। দেখল, আশালতা অনেক সাধ্য সাধনা করেও নন্দাকে বসার ঘরে পাঠাতে পারছে না।

নন্দার এক কথা। আমার বিয়ে হয়ে গেছে মা। অন্য লোকের সঙ্গে আমি আর কথা বলব না।

আশালতাও একগুঁয়ে। ভারি তো বিয়ে। তুই কি ঘর করেছিস পৃথ্বীশের সঙ্গে? যা না একটু কথা বলে আয়। ছেলেটা হাওড়া স্টেশন থেকে সোজা এখানে তেতে পুড়ে এসেছে।

তুমি চলে যেতে বলে দাও মা। আমি আর রীতেশের সঙ্গে কথা বলব না।

আমি সব কথা খুলে লিখেছি ওকে। তাই তো ছুটে এল তাড়াতাড়ি। এতদিনের টান একদিনের কাগজের বিয়েতে যাবে কোথায়! ছেলেমানুষ তুই! কি করতে কি করে বসেছিস—তার কি কোন গুরুত্ব আছে। বোকা মেয়ে! ওঠ্। মুখে চোখে জল

দিয়ে চুলটা আঁচড়ে গিয়ে কথা বল। আমি রাখালকে মিষ্টি আনতে পাঠিয়েছি।

তুমি চিঠি লিখেছো মা? নিজে থেকে? নন্দা যন্ত্রণায় ছটফট করছিল। আরও অবাক হচ্ছিল, গভীর বোকামিতে মায়ের কি গভীর বিশ্বাস। এখনো ভাবে, পৃথ্বীশের সঙ্গে তার বিয়েটা আদপেই কোন বিয়ে নয়।

নির্মল আশালতার কথা ভেবেই বলল, যা না মা—একবার গিয়ে একটু বসবি। কথা বলবি। তার চেয়ে বেশি কিছু নয়ত।

বাবার দিকে তাকিয়ে নন্দার খুব মায়া হল। জীবনের শেষ দিকে এসে অঙ্ক মেলে নি। বেশ যাচ্ছি। কিন্তু আমি যখন ওঘরে যাবো—তুমি সেখানে থাকতে পারবে না।

আশালতা মনে মনে বলল, পাগল হয়েছিস! আমি কেন যাব। তোদের মধ্যে নিজেদের কথা হবে। সেখানে আমি থাকতে যাব কোন্ দুঃখে। এভাবেই তো স্বামীস্ত্রীতে বোঝা পড়া হয়।

অন্য সময় হলে ভেঙিয়ে উঠত নন্দা। আজ আর পারল না। এত গভীর বিশ্বাস মা কোত্থেকে পায়?

রীতেশ উঠে দাঁড়াচ্ছিল। নন্দা সোজাসুজি বলল, সব জেনেছো তাহলে?

হ্যাঁ। কিন্তু—

নন্দা কোন কথা বলল না।

আমি ভেবেছিলাম তুমি অপেক্ষা করবে নন্দা। আমার পড়াশুনো শেষ হয়ে গেলে চেম্বার খুলেই আমি বিয়ে করতাম তোমাকে।

এবারে নন্দা মুখ তুলে তাকালো। সামান্য হেসে বলল, তাই নাকি!

রীতেশ সেই হাসি, সেই চোখের সামনে সোজাসুজি তাকাতে পারছিল না। সামান্য কেঁপে গেল। ঠিক এইসময়ে উল্টোদিকের মানসিক আশ্রম থেকে—আশ্রম না দূর ছাই!—নন্দা আজকাল মনে

মনে বলে—পাগলদের খাটাল—সেখান থেকে ভাঙা গলায় কে গেয়ে উঠল। শচীনদেবের পুরনো গান। তুমি যে গিয়াছ বকুল বিছানো পথে—এ-এ। বাকিটা শোনা গেল না। নন্দাও ভেতরে ভেতরে কেঁপে উঠল। তারা পাড়াতে প্রথম এসে দেখেছে—ছোকরা এক মালাকার সন্ধ্যের দিকে গোড়ের মালা ফিরি করতে আসত।

অনেক সাহস একত্র করে রীতেশ এবার বলল, তুমি এখন পর হয়ে গেছ নন্দা। তবু বলি—তুমি যদি আরেকটু সময় দিতে আমাকে—

আর কত সময় রীতেশ। তোমার চেম্বার খোলা অব্দি! তখন আমার বয়স কত হত বলতো?

না অতদিন নয় নন্দা। আর খুব বেশি দেরি ছিল না আমাদের বিয়ের।

আমি এক কথা শুনতে শুনতে বুড়িয়ে যাচ্ছিলাম রীতেশ। যা হয়েছে ভাল হয়েছে।

পৃথ্বীশবাবুকে তুমি সব বলেছো।

লুকোবো কেন? সে আমার স্বামী। বাঃ! বাইরের লোক নাকি!

সব বলেছো?

সব। তুমি আমাকে চিঠি লিখতে। বেড়াতে নিয়ে যেতে। প্রেজেনটেশন কিনে দিতে—

আর?

আর কি শুনতে চাও রীতেশ?

আমি কিছুই শুনতে চাই না। আমি সন্ধ্যেবেলা জানতে এসেছিলাম—তোমার স্বামীর কাছে তুমি কতখানি সত্যি হয়েছো। মানে কতটা সত্যি কথা বলেছো।

অর্থাৎ তুমি যে দু'দিন আমাকে ভয়ঙ্কর জোরে জড়িয়ে ধরে ছিলে—আমি সে সময় আগ বাড়িয়ে তোমাকে কয়েকবার চুমো খেয়েছিলাম—এই কথাগুলো বলেছি কি না জানতে চাইছো তো!

রাজা মিষ্টির বাক্স হাতে ঘরে ঢুকলো বলে দু'জনকেই চুপ করে থাকতে হল তিরিশ সেকেণ্ড। নন্দা জানে, আজ তার মা ঘটা করে রীতেশকে যত্ন করবে। কেননা, মাত্র দুদিন আগে পৃথ্বীশকে এবাড়ির চৌকাঠ থেকে আশালতা নিদারুণ অপমান করে তাড়িয়ে দিয়েছে। দেখা করে পৃথ্বীশ নন্দাকে অবশ্য হাসিমুখেই বলেছে, আমার সঙ্গে তোমার বিয়েতে ভদ্রমহিলা নিদারুণ শক্ খেয়েছেন।

নন্দা ভেবেছিল, পৃথ্বীশ না জানি কি বলবে তাকে। কি একটা কাজে বেরিয়ে গিয়েছিল নন্দা। বাড়ি ফিরে রাজার মুখে সব শুনে মায়ের ঘরে ছুটে গিয়েছিল। কিন্তু কিছু বলে নি তাকে। কারণ বলে কোন লাভ নেই।

আমাদের মধ্যে আর কিছু হয় নি নন্দা? রীতেশের মুখখানা থমথমে।

আর কি?

মুখের কয়েকজায়গা কুঁচকে গেল। তবু রীতেশ বলল, আমাকে তুমি মন দাও নি? আমি তোমাকে মন দিই নি?

ওঃ! এই কথা! হ্যাঁ দিয়েছিলাম। মন আর নেই রীতেশ। তুমি বুঝতে চাইছো কেন রীতেশ?

আমি বুঝতে চাই না। কারণ, তোমাকে ছাড়া আমার চলবে না। এ বিয়ে তোমার ভেঙে দিতেই হবে নন্দা।

কেন? আমি তোমাদের পৈতৃক সম্পত্তি! যেমন ইচ্ছা ব্যবহার করা যায়।

আমি ওসব জানি না নন্দা। তুমি আমার বউ। তোমার উপর আর কারও অধিকার থাকতে পারে না।

নন্দা ভেতরে ভেতরে কেঁপে গেল। নিজেকে স্থির রেখে খুব আস্তে বলল, ওসব কথা আর মাস ছয়েক আগে বললে পারতে। এখন আর হয় না। তুমি বরং বসে থাক। আমি মাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি—

রীতেশ শক্ত করে নন্দার হাত ধরল। তারপর ভীষণ কাতর

হয়ে বলল, তুমি না হলে আমার হবে না নন্দা। আমি পারব না। এই সত্যি কথাটা বুঝতে চাইছো না কেন? ও বিয়ে ভেঙে দাও। আমি মানি না নন্দা—

অবলীলায় হাত মুচড়ে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল নন্দা। ঘরের আলোটা তেমন জোরালো নয়। নন্দা বেরিয়ে যেতে আশালতা ঘরে ঢুকলো। মিষ্টিতে বোঝাই বড় প্লেটটা টেবিলে নামিয়ে দিতে দিতে রীতেশের মুখ দেখে বুঝলো, খুব খারাপ কিছু একটা ঘটেছে।

একটা মিষ্টি তুলে নিল রীতেশ। পরিষ্কার বুঝলো, এখন সে খেতে পারবে না.

আশালতা খাবার জন্য যত বলে, রীতেশের তত খারাপ লাগে। এ বাড়ি তো আগেকার মত আর নেই। এখানে সে ভাবী জামাইয়ের মত এসে বসত। এখন সে নন্দার দরজায় স্রেফ একজন প্রত্যাখ্যাত প্রার্থী।

আশালতা বলল, তুমি তো জানো আমার মেয়ে বড় জিদি। মন খারাপ করো না। সব ঠিক হয়ে যাবে। ও বিয়ে আমরা মানি না।

পৃথ্বীশবাবু কোথায় থাকে জানেন?

কে পৃথ্বীশ। এসেছিল আমার সঙ্গে কথা বলতে আমি হাঁকিয়ে দিয়েছি। হরিশ পার্কের পাশের গলিতে থাকে শুনেছি। লম্বা বাবরী। গুণ্ডার দলের সর্দারের মত দেখতে। যাত্রা থিয়েটার করে বেড়ায়—

এক প্লেট মিষ্টি এবং বিভ্রান্ত আশালতাকে ফেলে রেখে রীতেশ আচমকাই বেরিয়ে পড়ল।

পার্কের পাশের গলি। নাম বলতেই পাড়ার ছোকরারা বাড়ি দেখিয়ে দিল। পৃথ্বীশ বাড়ি নেই। রীতেশ গলির মুখে নজর রেখে পার্কের বেঞ্চিতে বসে থাকল।

জিনিসটা অপমানকর। কিন্তু জেদ ও দখল করার নেশায় ত্রিশ-বত্রিশ বছরের যুবকরা কখনো কখনো অধীর হয়ে যেসব কাজ করে—তার জন্যই রীতেশ পার্কের বেঞ্চে বসে অপেক্ষা করছিল।

রাত সওয়া ন'টা নাগাদ পৃথ্বীশ গুনগুন করতে করতে গলির মুখে ঢুকলো। তখন গিয়ে রীতেশ তাকে ধরল।

আপনিই পৃথ্বীশ দত্ত ?

হ্যাঁ। কি ব্যাপার ?

আমার নাম রীতেশ চক্রবর্তী। আপনার সঙ্গে কিছু কথা আছে আমার।

ও। বেশ তো। আমাদের বাড়িতে আসুন।

না। বাড়িতে নয়। এই তো পার্কের বেঞ্চে বসেই বলা যাবে।

এক সেকেণ্ড কি ভাবলো পৃথ্বীশ। বেশ তো। চলুন।

বেঞ্চে বসতেই দু'জনে দু'জনকে ভাল করে দেখল। রীতেশের চোখে চশমা। ফরসা কপাল। কোঁকড়া চুল। দামি কাপড়ের ট্রাউজার। কররডেলো কাপড়ের বুশ শার্ট। শৌভনিকের দলে এমন ড্রেস করে অনেকে রিহার্সেল দিতে আসে।

পৃথ্বীশের খাড়াই নাক—চওড়া কপাল, ঘন বাবরী, হাফহাতা শার্টের বাইরে শক্ত দু'খানা হাত বেরিয়ে ছিল। রীতেশ কোন ভূমিকা না করেই পরিষ্কার বলল, আপনি আমার বউকে বিয়ে করতে গেলেন কেন ? এ বিয়ে আপনি ভেঙে দিন—

পৃথ্বীশের দাঁতে দাঁত ঘষার শব্দ হল বুঝি। আমার স্ত্রীকে গিয়েই সে-কথা বলুন।

বলেছি। বলেই কি মনে পড়ল রীতেশের। বেশ জোর দিয়েই বলল, আপনার স্ত্রী নয় আমার স্ত্রী।

আপনি ভেবেছিলেন সেরকম। কিন্তু কাজেকর্মে তা করে উঠতে পারেন নি। হয়ত সময়মত সময় হয় নি আপনার। আমি উঠি বরং।

উঠে দাঁড়ানো পৃথ্বীশের দিকে তাকিয়ে রীতেশ বুঝলো, সে নিজে এখন কত অসহায়। নন্দা এই লোকটির বিবাহিতা স্ত্রী। পৃথ্বীশবাবু আরেকটু বসুন কাইণ্ডলি। আমার কথাটা একটু শুনুন। আমি নন্দাকে ভালবাসি।

এসব কথা কি আমার শুনতে ভাল লাগবে রীতেশবাবু?

আপনাকে শুনতেই হবে। আমি দিল্লী থেকেই ছুটে এসেছি। আমার কথাটা শুনুন। নন্দা অবুঝ। জেদি। ঝোঁকের মাথায় আপনাকে বিয়ে করে ফেলেছে।

কেন! আমি একজন পুরুষলোক নই! নদীর জলে ভেসে এলাম—আর নন্দা আমায় কুড়িয়ে নিয়ে বিয়ে করে ফেলল! রাত হয়েছে। পথ ছাড়ুন বাড়ি যাব।

দয়া করে বসুন। আমার কথাটা শুনুন। রোজ আমাদের দেখা হবে না পৃথ্বীশবাবু।

রীতেশের মুখে করপোরেশনের আলোর পোস্ট থেকে অল্প আলো এসে পড়েছে। সে মুখে কি ছিল পৃথ্বীশ জানে না। বলল, আমি নন্দাকে ভালবেসেছিলাম। নন্দাও বেসেছিল।

সে তো জানি।

আপনি সবই জানেন। সবই আপনার হাতে। যে জট পাকিয়েছে তা শুধু আপনিই খুলতে পারেন।

একটা খোলা কথা শুনুন রীতেশবাবু। আপনি তো জানেন, মানুষ পাল্টায়। আপনি হয়তো স্বপ্ন ধরে বসে আছেন। মাঝখান থেকে যে অনেক কিছু বদলে গেছে—

এত তাড়াতাড়ি বদলাতে পারে না। আমি নন্দাকে জানি। ও ঝোঁকের মাথায় চলে।

এও তো হতে পারে—ঝোঁকের মাথায় আপনার সঙ্গেই চলছিল। ঠাণ্ডা মাথায় আমার সঙ্গে বিয়ে বসেছে। সে এখন আমার বিবাহিতা স্ত্রী। কথাগুলো বলতে বলতে পৃথ্বীশ পরিষ্কার দেখল, তাদের দুজনের এই ডায়ালগ, এই সিচুয়েশন এই আলো আঁধারি—যে কোন নাটকের ক্লাইমাকস্ সিন হতে পারতো। এখন শুধু অডিয়েন্স নেই।

ঠিক এই সময়েই রীতেশ আচমকা উঠে দাঁড়াল। আর সঙ্গে

সঙ্গে পৃথ্বীশ বুঝলো তার ঠিক চিবুকের নিচে একটা লোহার গোলা এসে আটকে গেল।

পড়ে যেতে যেতে পৃথ্বীশ ডান পা তুলে একটা ভালো ওজনের লাথি ঝাড়লো। বাঁ হাত পেটে চেপে রীতেশও পালটা লাথি কষালো। পৃথ্বীশ সরে যাচ্ছিল বলে রীতেশের পুরো এফোর্টটাই মিসফায়ার করল।

রাতের ফাঁকা পার্ক। তাতে ঘাস এবং কিছু জায়গায় ধুলো। দু'টো প্যারালাল বার। সরকারী আলো জ্বলে যাচ্ছে। রেলিংয়ের বাইরে সামান্য লোক চলাচল। তার ওধারে বাড়িতে গৃহস্থরা নিত্য-কর্ম সমাপনে ব্যস্ত। আকাশে স্কুলবাড়িটার অনেক উঁচু দিয়ে একটি অপুষ্ট চাঁদ ব্যালান্স করে ঝুলে আছে। আর এখানে এই মাঠে নিঃশব্দে দু'জনের হাত চলছিল, পা চলছিল। একবার শোনা গেল, রীতেশের গলা—লোফার! হানড্রেড্ পারসেণ্ট লোফার!

উল্টোদিক থেকে পৃথ্বীশের গলা—ইউ ইমপোস্টার। নাও এটা সামলাও কেমন?

রীতেশের নাক ভিজে গেল। পৃথ্বীশ অবলীলায় ঘুষি চালাচ্ছিল।

নাও আরেকখানা। কেমন?

এই ঘুষিটাও রীতেশের ভিজে নাকে পড়ে পিছলে গেল। রক্ত পড়ছিল। তাতে পার্কের মাঠের ধুলো মাখানো। রীতেশ পড়ে যেতে যেতে বুঝলো, সে হেরে যাচ্ছে। তাই যতটুকু জোর গায়ে ছিল—সবটুকু একত্র করে পৃথ্বীশের কোমর বরাবর ঝাঁপিয়ে পড়ল। পড়ে দু'হাতে জড়িয়ে পৃথ্বীশকে মাটিতে পেড়ে ফেলল। এবার—

পৃথ্বীশ আগাগোড়া শরীরটাকে নিজের শরীর দিয়ে ঢেকে ফেলে ওর নাকের ওপর, মুখের ওপর, বুকের ওপর নিজের মাথাটাকে হাতুড়ি বানিয়ে রীতেশ ঠুকতে লাগল। চাপা গলায় বলতে লাগল—আমি ছিলাম না কলকাতায়—সেই ফাঁকতালে—সেই ফাঁকতালে

ওদের দু'খানা শরীর একসঙ্গে মিশে যাওয়ায় খানিকক্ষণ বোঝার

উপায় থাকল না—কে ওপরে? কে নিচে? জট পাকানো দু'টো মানুষ গড়িয়ে গড়িয়ে একবার হাতদশেক দক্ষিণে চলে গেল। আবার উলটো প্যাঁচে হাত পাঁচেক পিছিয়ে এল।

তারপর দেখা গেল, নির্জন পার্কে পৃথ্বীশ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মাটিতে পড়ে থাকা রীতেশকে আবার ফেলে দু'টো লাথি দিল। রীতেশ শব্দও করল না।

পৃথ্বীশ হাত দিয়ে চোখের ওপর, নাকের নিচের ধুলোমাখা রক্ত মুছে ফেলল। থুথুর সঙ্গে মুখ থেকে খানিক ঘাস আর ধুলোও বেরিয়ে এল। বুক পিঠ ঝেড়ে খানিক এগিয়ে গিয়েছিল।

পৃথ্বীশ কি মনে করে ফিরে এল। হাজার হোক রীতেশ তার থেকে বছর চারেকের ছোটোই হবে! কোথায় শিলচর। কোথায় দিল্লী! নিঝ্‌ঝুম হরিশ পার্কের মাঠে রীতেশ এখন উপুড় হয়ে পড়ে আছে। চশমা টুকরো টুকরো। আন্দাজে হাতড়ে হাতড়ে ডট্‌পেন মানিব্যাগ, বাতাসে উড়ে বেড়ানো সাত আটখানা দশ টাকার নোট ওই ঝাপসা আলোয় খুঁজে বের করল পৃথ্বীশ। স্বাধীনতার রজত-জয়ন্তীর কয়েকটা ঝকঝকে আধুলিও পেল। সেগুলো পার্কের মরা ঘাসে মণিমুক্তার মত জ্বলছিল।

পৃথ্বীশ দু'হাতে রীতেশের মাথাটা তুলে ধরল। টেরিকটের সাদা শার্টে ঘাসের দাগ। বাঁ চোখটা ফুলে গেছে। ট্রাউজারের বোতাম নেই এক জায়গায়। পৃথ্বীশ বুঝলো তার নিজের ট্রাউজারেরও গোটা দুই বোতাম গেছে। পার্কের গায়ে শুকনো টিউবয়েলে জল পেল না। ঘোড়াকে জল খাওয়ানোর আদ্যিকালের জংধরা লোহার চৌবাচ্চায় বৃষ্টির জল জমে ছিল। তাতে রুমাল ভিজিয়ে এনে রীতেশের কপাল মুছিয়ে দিতে লাগল পৃথ্বীশ।

উঠতে পারবেন? না ধরব—

পায়ে জোর পাচ্ছি না—

আমিও তো পাচ্ছি না। বলে হেসে ফেলল পৃথ্বীশ।

তারপর দেখা গেল, ট্রাউজার পরা টলটলায়মান যুবক নেশা করলে যেমন চুর হয়ে ধরাধরি করে চলে—তেমনি ঢিলেঢালা ঢঙে একে অন্যকে ধরে উঠে দাঁড়াল। নিন্—ডান পায়ে ঝাঁকুনি দিন—ঠিক হয়ে যাবে।

জোর পাচ্ছি না।

পারবেন রীতেশবাবু। ঝাড়ুন! আমি ধরেছি। এই তো—আরেকবার—

রীতেশ পা ঝাড়তে ঝাড়তে হেসে ফেলল। তার হাতখানা পৃথ্বীশের কাঁধে। কি যে হয়ে গেল বলুন তো ব্যাপারটা। মিনিংলেস।

তা কেন? এই তো নরমাল।

হবে! বলে রীতেশ কয়েক পা এগিয়ে নিজেই চলতে থাকল। এখন কোথাও বসে খাওয়া দরকার। পেট চোঁ চোঁ করছে।

আমারও।

ট্যাকসি ওদের একটা সর্দারজীর দোকানে নিয়ে গেল। ডাক্তার হিসেবে রীতেশ পৃথ্বীশকে অ্যাডভাইস করল, দই খাবেন। সব সময় দই খাবেন। খাওয়ার শেষে বড় তুই খুরি দই নিল ওরা।

পথে বেরিয়ে পৃথ্বীশ বলল, আমার আজ বাড়ি ফিরতে ইচ্ছে করছে না।

রীতেশ একটু খুঁড়িয়ে পানের দোকানে গেল। তু'খিলির অর্ডার দিয়ে বলল, আমারও না। কিন্তু কলকাতা এত তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়ে বুঝলেন—আমার তো হসটেল লাইফে বিছানায় চোখ খুলে শুয়ে থাকতে হত।

চলুন খানিকটা বেড়াই।

এল্গিন রোড ধরে ডাইনে ঘুরে তু'জনে ভিক্টোরিয়ায় পৌছল। রবীন্দ্রসদনের ফোয়ারা থেমে গেছে। রাণীর বাগানের পেছনটায় বেঁটে গেট টপকে ওরা ভেতরে ঢুকলো। বড় বড় গাছের অন্ধকার। তার পাশেই ফাঁকে ফাঁকে ফিকে অন্ধকার মাখানো জ্যোৎস্না। তু'জনে

দিব্যি স্প্রিংয়ের মত সমান তালে সাদা বাড়িটার সিঁড়ি ধরে উঠে গেল কয়েক ধাপ। পাতলা হাওয়া দিচ্ছিল। সামনেই একজোড়া ব্রোঞ্জের সিংহ উঁচু বেদির ওপর মুকুট মাথায় মহারাণী ভিক্টোরিয়াকে পাহারা দিচ্ছে। পেছনেই স্মৃতিসৌধের বিশাল অন্ধকার ছায়া অনেকটা জায়গা আবছা করে রেখেছে।

রীতেশ একধাপ উঁচুতে বসেছে। তার পাশেই নিচের ধাপে পৃথ্বীশ। এখানে কলকাতা এখন ছবির মত। দূরের রাস্তা দিয়ে ফুলস্পীডে গাড়ি যাচ্ছে আসছে।

আমরা এখনো খুব বুনো। তাই না পৃথ্বীশবাবু?

কিরকম?

টাকা, রক্ত, মেয়েমানুষ, জমি—এসব জিনিসের অধিকার ছাড়তে আমরা কেউ রাজি নই। যে জন্যে পঞ্চাশ হাজার বছর আগেও যেমন যুদ্ধ হত—এখনো তেমন হয়।

যেমন আজ হল!

পৃথ্বীশের কথায় রীতেশ হোহো করে হেসে উঠল। ওর দমকা হাসির ভঙ্গী পৃথ্বীশের মনের গ্লানি এক সেকেণ্ডে ধুয়ে দিল। পরিষ্কার বলল, একটা জিনিস কিন্তু প্রমাণ হয়ে গেল রীতেশ—আমরা দু'জনেই নন্দাকে ভালবাসি।

গম্ভীর রীতেশ কোন জবাব দিল না।

রাণীর মুকুটের দিকে তাকিয়ে পৃথ্বীশ বলল, অন্তত আমরা মনে করি আমরা ওকে ভালবাসি। আসলে অধিকার করতে চাই। নিজের জিনিসের মত অবাধে নাড়াচাড়া করতে চাই ওকে। তাই তো।

রীতেশ পৃথ্বীশের মুখের দিকে তাকালো। চোখ দেখতে পাওয়া গেল না। এই মানুষটাকে আশালতা বলেছিলেন, লোফার—

হুহু করে অনেক কথা মনে আসছিল পৃথ্বীশের। এর নাম ভালবাসা। এর জন্যে এত। মুখে বলে ফেলল, এর মধ্যে কোথায় যেন একটা স্বার্থপরতা আছে। সেলফিসনেস্। গর্ব।

তা বলছেন কেন? আমি বলব পৃথ্বীশবাবু—আপনাকে জেনে, বুঝতে পেরে, নন্দা হয়ত নিজেকে সমর্পণ করেছে—

তাই বলে আপনার সঙ্গে এতদিনকার ভাব ক্ষয় হয়ে যাবে একটা বিয়েতে?

আমার সঙ্গে যা-কিছু ছিল স্বপ্নে—কথাবার্তায়। কোন পরিণতি ছিল না সেসব স্বপ্নের। সেসব কথার। তাই একদিন সেসব জিনিস ক্ষয় হতে লাগল। আমি টের পাই নি। নন্দা বুঝতে পেরেছিল। ওর সাহস ছিল। তাই সব ভেঙে দিয়ে পরিণতির জন্যে আপনার সঙ্গে মিশে গেল। আমি দুর্বল বলেই ট্রুথকে দেখতে পাচ্ছি না। দেখতে চাই না। সামনে যেতে ভয় পাই। তাই কষ্ট পাচ্ছি। আপনি বললেন না—এ হল গিয়ে সেই অধিকার করতে চাওয়ার জেদ। অবাধ একচেটিয়া অধিকার। সেলফিসের মত মনোপলি লাভ! বাধা পেয়ে অভিমান, অন্ধ গর্ব আমাকে দখল করে নিচ্ছে—

পৃথ্বীশ চেষ্টা করেও রীতেশের চোখ দেখতে পেল না। সর্দারজীর দোকানে খাওয়ার শেষে মৌরি আর মিছরির টুকরো দিয়েছিল। জিনিসটা চিবোতে বেশ স্বাদ। রাস্তায় অনেকক্ষণ গাড়ি কমে গেছে। দু'জন নাইটগার্ড বুটের আওয়াজ তুলে রোঁদে বেরিয়েছে। এখানে দেখলে নির্ঘাত ওদের ধরবে। দু'জনে তাই গুটি গুটি উঠে গিয়ে রাণীর বেদিতে উঠে গেল। ভিক্টোরিয়ার প্রশস্ত কোলে চিলের পালক পড়েছিল দু'খানা। পৃথ্বীশ একখানা কুড়িয়ে নিয়ে কান খোঁচাতে লাগল। আরাম তখন তার সারা মুখে।

নাইটগার্ডরা বেরিয়ে যেতেই পৃথ্বীশ বলল, বেশি রাতে কলকাতার চেহারাই আলাদা। এখান থেকে আমার অফিসও কাছে।

আপনি তো পার্ক স্ট্রীট ব্রাঞ্চে আছেন?

হলারিথ সেকসনে। আসুন না কাল—টিফিন নাগাদ।

যাব। দেখি যদি পারি।

আসা চাই। বলতে বলতে পৃথ্বীশ শুয়ে পড়ছিল।

রীতেশ হেসে বলল, রাতটা এখানেই থাকব নাকি আমরা ?

ক্ষতি কি ! আগে তো কোনদিন থাকা হয় নি। আপনি সঙ্গে আছেন। এই সিচুয়েশন। এই সিকোয়েন্স—জীবনে হয়ত আর কোনদিন পাব না। সাদা সিঁড়িগুলো দেখুন জ্যোৎস্নার কারসাজিতে কেমন সবুজ হয়ে উঠছে। এমন স্টেজ—এত বিরাট মঞ্চ কলকাতার আর কোথাও নেই।

তা কেন ? এর চেয়েও বড়—আরও অনেক আছে।

কোথায় রীতেশবাবু।

কেন ? গঙ্গার দু'পারের পাবলিক ঘাটগুলো। কত চওড়া বাঁধানো সব ঘাট। কত সিঁড়ি তাতে। নৌকা করে যাবার সময় এক একটা স্টেজ মনে হবে। আপনি থিয়েটার করেন। আপনার মনে ধরবে।

কত জিনিস দেখি নি জীবনে।

পাশেই বাঁধানো পুকুরে জল টলটল করছিল। তার গায়ে সত্তর বছরের পুরনো মোটা গুঁড়ির ক্যাসিয়া-গাছে হলুদ গুঁড়ো ফুল ফুটেছে মাঝরাতে। রাত দু'টো নাগাদ সেই গাছ থেকে একটা পেঁচা উড়ে বেরিয়ে এল। অন্য দিনের মতই রাণীর ডান হাতে এসে বসল। দেখলো, ভিক্টোরিয়ার পায়ের কাছে দু দু'টো মানুষ দিব্যি ঘুমোচ্ছে। একজনের হাত বুকের ওপর। ওদের মুখে রাগ, দুঃখ, সুখ, বা শোকের কোন চিহ্ন নেই। পেঁচা নিজেকেই তখন প্রশ্ন করল, তাহলে আমি কি মানুষদের আজও চিনি নি ?

আরও অনেক পরে প্রায় ভোরবেলার বাতাসে রীতেশ ঘুম ভেঙে উঠে বসল। ফিকে অন্ধকার ফুঁড়ে কলকাতা জেগে উঠছিল। ভিক্টোরিয়ার মাঠে কেয়ারি করা ফুলের বাগানে কলা ফুলগুলো আলো বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে হলুদ হয়ে উঠছিল।

ঘুমন্ত পৃথ্বীশের মুখখানা আকাশের দিকে। মাথার কাছেই মহারাণীর গাউন ঢাকা পা। কি সিকোয়েন্স! এই অবস্থায়

একখানা পাথরের চাঁই দিয়ে পৃথ্বীশকে ঠুকে ঠুকে মেরে ফেলা যায়। পাছে ঘুম ভাঙে—তাই রীতেশ নিঃশব্দে নেমে গেল।

॥ পাঁচ ॥

পাঠক। রীতেশ কোথায় উঠল, কি খেল—তার একসট্রা জামা কাপড় সঙ্গে আছে কিনা—এসব ব্যবস্থা করা আমার কাজ নয়। বলে দিতে পারতাম—কলকাতায় একজন বড়লোক পিসিমার বাড়ি উঠেছে। তাদের বাড়ির গাড়িই রীতেশকে আমার প্রয়োজন মত জায়গায় মুহূর্তে পোঁছে দিচ্ছে। কিংবা সে হোটেলেও উঠতে পারে। হয়ত মেডিক্যাল হসটেলে। কিন্তু এই সব লিখে কি লাভ!

একেই আমি গল্প বানাতে গিয়ে পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছি। এসব আমার কাজ নয়। তার ওপর পৃথ্বীশ, রীতেশ, নন্দা, নির্মল, আশালতার সব কিছুর ভার যদি আমাকে নিতে হয়—পরিষ্কার বলছি, সেকাজ আমি পারব না।

আমার চেনা লোকজনের কথা আমি লিখছি। যেটুকু জানি সেটুকুই শুধু লিখি। একটু আধটু বানাচ্ছি বটে। তবে বেশি না। এর পরে আমি সবার সবকিছুর কৈফিয়ত দিতে প্রস্তুত নই।

সারারাত আকাশের নিচে শুয়ে পৃথ্বীশের ঠাণ্ডা লাগতে পারে। মাথা ভার ভার হতে পারে। গা ম্যাজম্যাজ করতে পারে। সে দেরিতে অফিসেও যেতে পারে। পাঠক—এসব জিনিস আপনাকেই আন্দাজে ভেবে নিতে হবে। আমি সব লিখতে পারব না। আমি গল্পের মূল জায়গায় কত তাড়াতাড়ি পৌঁছতে পারি—জীবনের কথা কত সরল করে বলতে পারি—এটাই আমার কাজ।

অতএব আমি যা দেখতে পাচ্ছি—বিনা প্রশ্নে আপনিও তাই দেখুন। কোনরকম পয়েন্ট অব অর্ডার তোলা চলবে না।

বেলা দেড়টা। স্টেট ব্যাংকের স্টাফ ক্যান্টিন রুমের বড় জানলাটার সামনে ছ'প্লেট গরম গরম মাটন স্যুপ নিয়ে পৃথ্বীশ আর নন্দা মুখোমুখী বসে আছে। টেবিলে টেবিলে অনেকেরই প্লেটে লুচি। কারও কারও ফিস ফ্রাই। পৃথ্বীশের বেগুনি রঙের বুশশার্ট, স্লেট রঙের লাইন তোলা ট্রাউজার, জানলার আলোর উল্টোদিকে কচি কলাপাতা রঙের শাড়িতে নন্দা—ওদের ছ'জনকেই একেবারে একজোড়া খুশি প্রজাপতি করে দিল। অন্তত বাইরে থেকে দেখতে তো তাই।

তিন প্লেট স্যুপ বললে?

হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে পৃথ্বীশ বলল, একজন গেস্টকে এক্সপেক্ট করছি। আসবে নিশ্চয়। এনি মোমেণ্ট এসে পড়তে পারে—

এখন আবার কাকে আসতে বলেছো? আমি ছুটে এলাম জরুরী কথা বলতে। কাল সন্ধ্যেবেলা রীতেশ এসেছিল—

জানি।

জানো?

নন্দা অবাক হয়ে পৃথ্বীশের মুখে তাকালো। তক্ষুনি পৃথ্বীশ তার পেছনের কাকে দেখে হেসে উইস করল। মাঝের চেয়ারটা এগিয়ে দিল। ঘুম হয়েছিল আপনার?

রীতেশ বসতে বসতে অবাক নন্দার মুখের দিকে তাকিয়েই বলল, ফাইন। একটাও মশা নেই তো। ডাইরেক্ট গঙ্গার হাওয়া। নন্দা কতক্ষণ এলে?

বিভ্রান্ত, বিস্মিত নন্দা খুব আস্তে বলল, খানিক আগে। তারপর ওর মুখের দিকে অনেক দিন পরে চোখ তুলে বলল, চোখে গুঁতোনো খেলে কোথায়? ভীষণ ফুলেছে তো। চোখও লাল হয়েছে।

নন্দা স্বাভাবিক হতে চাইছিল। অথচ কি করে ওরা ছ'জনে মাত্র কয়েক ঘণ্টায় এত জানাশুনা হয়ে গেল—তাই জানবার জন্যেও নন্দার ভেতরটা অস্থির হয়ে উঠছিল। বাইরে থেকে তা বুঝতে

না দিয়ে খুব সাবধানে নন্দা চামচে স্যুপ তুলে নিল। সাদা রঙের গরম ঝোল। কিছু আলু আর পেঁপের ফালি। পাঁচ পিস মাটন। রীতেশকেও গরম গরম একপ্লেট দিয়ে গেল।

আপনি আসবেন জানতাম। একে বলে ড্রামাটিক ইনটিউশন।

ইনটিউশন বুঝি না। আপনার সঙ্গে কাল আলাপ হওয়া থেকে আমি ভয়ঙ্কর একটা আকর্ষণ বোধ করছি। আপনি না বললেও ঘুরে ঘুরে ঠিক খুঁজে আপনার এখানে আসতাম। হলারিথ সেকসনে গেলাম—একজন বুড়ো মত ভদ্রলোক বললেন, আপনি ক্যানটিনে। তাই সোজা চলে এলাম।

তোমাদের কোথায়? কখন? আলাপ হল?

বিস্মিত নন্দা আরও অনেক প্রশ্ন করত। তাকে সে চান্স দিল না রীতেশ। আরও বিস্মিত করে দিয়ে বলল, পৃথ্বীশবাবুকে বিয়ে করে তুমি ঠিকই করেছ নন্দা। সিলেকসনের কোন ভুল নেই।

এ কোন্ রীতেশ? নন্দা অবাক হয়ে ওর মুখের দিকে তাকাল। বাঁ চোখটা লাল হয়ে ফুলে আছে। ফরসা কপালে ছড়ে যাওয়ার দাগ। কোথায় আছাড় খেল আবার। ছেলেদের নিয়ে এই এক মুশকিল। মাথা ফাটাবার জন্যে মানুষ যেন তৈরি হয়ে আছে। মনে মনে নিজেকে নন্দা দু'বার বলল, আমি সামান্য মেয়ে মাত্র। সামান্য মেয়ে।

পৃথ্বীশ মাথা নীচু করে স্যুপ চেটেপুটে সাবাড় করে ফেলল। আমি উঠছি। তোমরা গল্প কর। খারাপ লাগলে ময়দানে গান্ধীজীর কাছাকাছি গিয়ে বসতে পার। আমি ঘণ্টাখানেকের ভেতরেই যাচ্ছি।

নন্দা ঠিক বুঝে উঠতে পারল না, এটা পৃথ্বীশের কোন অভিনয় কি না? এত কি কাজ থাকতে পারে ওর। এখনো তো লাঞ্চ শেষ হয় নি। একা থাকতে দিয়ে ওকি আমাদের বোঝাপড়া করার সুযোগ দিয়ে গেল? মানুষ খুব চালাক হয়।

আমার বর্তমান স্বামী—মালিকও বলা যায়—এইমাত্র আমাকে আমার প্রেমিকের সামনে ফেলে রেখে গেল। অথচ আমি ছুটে এসেছিলাম—পৃথ্বীশকে এই কথাটা বলব বলে, তুমি যত তাড়াতাড়ি পার আমাকে তোমাদের বাড়ির বউ করে ঘরে তোল। আমি প্রাইমা স্টোভেই তোমাদের বাড়ির রান্না করতে পারব। গ্যাস, ফ্রিজ—এসব বাসনা বা খেলনায় আমার আদৌ কোন আগ্রহ নেই। কেননা, মা যে কি করে বসবে আমি বলতে পারছি না। আর বিশেষত রীতেশ যেভাবে এসে আমাকে দাবি করছে—কোনদিন যদি পুরনো ট্রাঙ্কের মত মাথায় তুলে নিয়ে চলে যায়—তাহলে আমি কি করতে পারি? আমার একার শক্তি কতটুকু? হাজার হোক আমি মেয়ে মানুষ তো। ভালবাসা তোমাদের গায়ের জ্বর। ভালবাসা আমাদের নিঃশ্বাস। ভুল হলে বুকে আটকে যায়। ঠিক হলে বড় সুখ হয়। আমি আর সুখ চাই না পৃথ্বীশ। আমি আর সুখ চাই না রীতেশ। আমাকে শান্তি দাও। স্বস্তি দাও।

রীতেশের সুপ শেষ। আলগোছে বলল, তুমি আমায় ভয় পাও নন্দা। তাই না? ভয়ের কিছু নেই। আমি আর তোমার জন্যে ওরকম করব না। দেখো তুমি।

নন্দা শুনছিল আর ওর চোখ দেখছিল। তাতে পলক পড়ে না। মাত্র কয়েক ঘণ্টায় রীতেশ এতটা পালটে গেল কি করে। কিছুকাল আগেও রেস্তোরাঁয় এরকম মুখোমুখি বসে আমি ওর হাত ধরেছি। আজকের দিনটা তার চেয়ে কত আলাদা।

নন্দা হেসে উঠল। তারপর আস্তে বলল, তোমার পড়াশুনো শেষ হলে ভাল দেখে একটি মেয়ে বিয়ে কর। আমার চেয়ে অনেক সুন্দরী মেয়ে পাবে। সে তোমাকে অনেক শান্তি দেবে। দেখবে—সে আমার মত বাজে হবে না।

সেকথা আলাদা। তা আমি আলাদা করে ভেবে দেখবো কি

করা যায়। এখন তো নয়। চল আমরা বেরোই। পৃথ্বীশ এসে গেলে এক সঙ্গে বসে গল্প করা যাবে।

পার্ক স্ট্রীটের রঙীন শো উইনডো, বেলুন ঝোলানো রেস্তোরাঁ রিডাকশন সেলের পতাকা ওড়ানো দোকান—তার পাশ দিয়ে ফুটপাথ—তাতে নন্দা আর রীতেশ পাশাপাশি হাঁটছিল।

নন্দা এখন পরিষ্কার জানে, দু'জনে এখন সম্পর্কহীন মানুষ। শুধু পাশাপাশি হেঁটে যাওয়া। পৃথ্বীশ কেন যে আমাদের এ রকম ছেড়ে দিল। কাল সন্ধ্যেবেলায় রীতেশের চোখমুখ দেখলে সে কিছুতেই একাজ করতে পারত না।

তুমি আগে ওকে চিনতে ?

কে ? পৃথ্বীশবাবু ? কালই তো তোমাদের ওখান থেকে বেরিয়ে গিয়ে আলাপ করলাম। চমৎকার লোক। তোমার হিসেবে কোনো ভুল হয় নি। বড় ভালো লোক। আর কি সুন্দর লাথি মারেন। কি সুন্দর কথা বলেন।

নন্দা অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে দেখে রীতেশ বলল, হ্যাঁ সত্যি। তোমাকে নিয়ে কাল রাত দশটায় আমরা দু'জনে মারামারি করেছি। হরিশ পার্কে। পৃথ্বীশেরও খুব লেগেছে।

আচ্ছা কি লোক বলতো তোমরা ? নন্দা মাথা নিচু করে হাঁটছিল। পাশে রীতেশ। গান্ধীজীর মাথার পেছন থেকে রোদ এসে সবার চোখ ঝলসে দিচ্ছে। নন্দা আর কিছু বলতে পারল না। একবার চোখ খুলে রীতেশের মুখখানা দেখতে গিয়ে সব ঝাপসা হয়ে গেল। নাক, মুখ, চোখ, মাথার পাশ দিয়ে একটা ধোঁয়াটে কিসের আউট লাইন। তার ভেতরের রীতেশের মুখখানা মুছে যাচ্ছিল।

রীতেশ একবার ফিরে তাকিয়েই সোজা সামনের দিকে মুখ তুলে হাঁটতে লাগল। গান্ধীজীকে ঘিরে ফুলের বাগান, সবুজ ঘাসের লন, গোল রেলিংয়ের বাইরেই সেই বিখ্যাত বেওয়ারিশ পুকুরে যার যা ইচ্ছে করে যাচ্ছিল।

ওরা দু'জনে রেলিং ধরে দাঁড়াল। কেউ কোন কথা বলতে পারল না খানিকক্ষণ। প্রথম রীতেশই বলল, কাঁদছিলে নন্দা?

আচমকা মুখ তুলে সোজা রীতেশের দিকে তাকাল নন্দা। দুই চোখ এখুনি জলে ভরে যাবে। আমি সামান্য মেয়ে এ তোমরা কি করলে! তাও আমার মত সামান্য একজনের জন্যে!

রীতেশ মুখ নামিয়ে নিয়ে পুকুরের ভেসে বেড়ানো কচুরিপানার দিকে তাকিয়ে থাকল। নন্দার ভেতরটা মোচড় দিয়ে এক ধাক্কায় গলার কাছে এসে দলা পাকিয়ে গেছে। এর নাম কষ্ট? না সুখ? দেখলো, তা সে নিজেই জানে না।

এভাবে খানিকটা কেটে যেতেই ওরা দেখল, পৃথ্বীশ একজন একদম পাক্কা ড্যাণ্ডির মত শিস্ দিতে দিতে রাস্তা পার হয়ে এদিকেই এগিয়ে আসছে।

একি! এর ভেতর হয়ে গেল পৃথ্বীশবাবু?

এক্স লাভারের সঙ্গে নতুন বউকে ছেড়ে রেখে কেউ সুস্থির থাকতে পারে! ওরা একসঙ্গে দমকা হেসে উঠলেও নন্দা তাতে পুরোপুরি যোগ দিতে পারল না। নিজেরই সন্দেহ হল—সে কি সত্যি হাসছে। আয়না নেই কাছে যে নিজের মুখখানা একবার যাচাই করে নেবে।

হাসি থামিয়ে রীতেশ দপ করে বলল, এক্স কোথায়? আমি তো এখনো নন্দাকে ভালবাসি।

ট্রাম যাচ্ছে। বাস যাচ্ছে। পরিষ্কার রোদের আলো। তার ভেতরে দু'জনই মুখ ঘুরিয়ে দেখল, নন্দার চোখ জলে ভরে গেল।

এ তোমরা কি করলে? আমার জন্যে মারামারি? ছিঃ! আমাকে তোমরা ভাল করে দেখ। আমি তোমাদের কারও যোগ্য নই। তোমরা আমাকে ভাল করে দেখো নি তাই। আমি সামান্য। খুব সামান্য একটা মেয়ে!

দু'জনের কেউই নন্দাকে কখনো এভাবে দেখে নি। এখন যা দরকার—তা হল—নন্দার মুখখানা ভাল করে মুছে নিয়ে সোজা হয়ে

দাঁড়ানো। কলকাতার রাস্তা। ছ'জন পুরুষ। একজন মেয়ে—তাঁর চোখে আবার জল। ভিড় জমতে কতক্ষণ।

রাস্তা দিয়ে যারা যাচ্ছিল—তারা এমন লোভনীয় দৃশ্য ফিরে ফিরে দেখছিল। নন্দা ছ'জনের সামনে এখন কোমরে গোঁজা রুমাল কি করে খুলে নেয়। রীতেশ ব্যাপারটা বুঝে উল্টো দিকে তাকিয়ে নন্দার মুখখানা রাস্তার দিকে আড়াল করে দিল। সেই ফাঁকে পৃথ্বীশ পকেট থেকে রুমাল এগিয়ে দিল।

ওদের ভঙ্গী দেখে নন্দার হাসি পেয়ে গেল। লাগবে না। বলে একা একা পুলিশ ক্লাবের দিকটার ফাঁকা মাঠে ঢুকে গেল নন্দা। কোন গাছ নেই যে তার দিকে তাকিয়ে চোখ মুছে নেবে। দূরে দূরে অনেকেই বল পেটাচ্ছে। তিনটেও বাজে নি। ওর পেছন পেছন পৃথ্বীশ আর রীতেশও ঢালু মাঠ ধরে পুরু ঘাসের এলাকায় চলে এল। এখানটায় দর্শক নেই।

এলোমেলো হেঁটে ওরা তিনজনে মাঠ ফুঁড়ে অনেক ভেতরে চলে গেল। পৃথ্বীশ বসতে চাইছিল। নন্দা দিচ্ছিল না। কোন জায়গাই ওর পছন্দ হচ্ছিল না।

রীতেশ বলল, আমি এই ভাঙা পা নিয়ে আর হাঁটতে পারছি না।

নন্দা ফিরে তাকিয়ে বলল, বাহাত্নরি করে মারপিট করতে বলেছিল কে!

ও যে এমন গুণ্ডা আমি জানতাম!

পৃথ্বীশ এগিয়ে ছিল। থেমে গেল। আমার লাগে নি বুঝি। এমন ছুটে এসে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন।

ভয়ঙ্কর ডাকাত। পৃথ্বীশের দিকে তাকিয়ে নন্দা এমন করে কথাগুলো বলল, তাতে যে কোন পুরুষেরই ভালো লাগার কথা। পৃথ্বীশেরও লাগল। গর্বও হল। আমি কি করে নন্দাকে পেলাম। ভেবেই রীতেশের মুখ দেখে ওর মন খারাপ হয়ে গেল। এক মনে নন্দার পরিহাস স্নিগ্ধ মুখখানা দেখতে গিয়ে রীতেশ

অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছে। হয়ত ভাবছিল, এতো আমারই ছিল। আমারই।

এই রীতেশ।

পৃথ্বীশ ডাকতেই চমকে ফিরে তাকালো। নন্দা হাসতে গিয়ে গম্ভীর হয়ে গেল।

কি হচ্ছিল। কিছু না তো। বলে রীতেশ সামনের বড় আম গাছটার দিকে তাকালো। তাদের শিলচরের বাড়িতে এমন সাইজের গাছ গোটা তিনেক আছে। যত্ন হয় বলে তাতে ফল ধরে। এ গাছটা অযত্নে বেড়ে উঠেছে। দেখেই বোঝা যায়—ফল ধরে না। মধ্যবয়সা।

রীতেশের দৃষ্টি ধরে ধরে নন্দার চোখও গাছটায় গিয়ে আটকে গেল। একতলা সমান উঁচু হয়ে মোটা গুঁড়ি উঠে গেছে। সেখানটায় কোন ডালপালা নেই। তারপরেই গাছটা ঝাঁকড়া হয়ে চারদিকে নিজেকে ছড়িয়েছে। ঠিক এই জায়গায় একটা আগাছা গুঁড়ি আঁকড়ে ওপরে উঠে গেছে। সেখানে তার বেগুনি ফুল।

দেখেই নন্দা বলল, আমি খোঁপায় দেব। নিয়ে এস।

পৃথ্বীশও দেখল। রীতেশও। কিন্তু কেউ বুঝতে পারল না, এই আদেশটা কাকে?

আমার অনেকদিনের শখ—অমন ফুল খোঁপায় রাখি।

কথা বলছিল আর নন্দার চোখ দিয়ে, লম্বা একবেণী চুঁয়ে ওর এই ইচ্ছেটুকু সারা ময়দান ঢেকে দিচ্ছিল।

ও ফুল না হলে আমি এখান থেকে উঠছি নে। বলেই নন্দা যেখানে ছিল সেখানেই বসে পড়ল। গাঢ় সবুজ ঘাসের ভেতর কচি কলাপাতা রঙের শাড়িতে মোড়া নন্দা এই বিরাট মাঠে এখন একটি স্তবক হয়ে পড়ে আছে। বিকেলবেলায় আলোতে আবিষ্কারের আনন্দ সবাইকে পেয়ে বসতে পারে।

রীতেশ বলল, আমি অতটা উঠব কি করে গাছে ? আমার তো পায়ে জোর নেই। ব্যথা—

তা আমি জানিনে। ও ফুল আমার চাই।

পৃথ্বীশ বলল, ওটা ফুল কোথায় ? ও তো পরগাছা !

তা হোক। কি সুন্দর রঙ। আমার নাহলে চলবে না বলছি। আমার চাই।

এত জেদ কেন বলতো ?

এবার নন্দা সরাসরি ওর মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, আমায় চাও তো নিয়ে এসো।

কার ! খুব ! চমৎকার !

ওসব বুঝি না। আমার চাই।

আমার পাঁজরে এমন জোরে মেরেছে রীতেশ—জোরে নিঃশ্বাস নিতে গেলে আটকে যাচ্ছে নন্দা—

ওসব আমি জানি না। ও ফুল আমার চাই। আমি কি মারামারি করতে বলেছিলাম ?

রীতেশ একটু দূরে ছিল। ল্যাংচাতে ল্যাংচাতে এগিয়ে আসছিল। পৃথ্বীশ আমায় মারে নি ? আর জুতো পায়ে দিয়ে ও-গাছে কে উঠবে ? আমি পারব না।

জুতো খুলে ফেল। দেখি কে আনতে পারে—বলেই এমনি সুখী হাসি হাসল নন্দা—একবার পৃথ্বীশের দিকে তাকিয়ে—একবার রীতেশের দিকে। ওরা দু'জনেই জ্বলে গেল সে হাসিতে। কে বলবে, খানিক আগেও এই নন্দার চোখ জলে ভরে গিয়েছিল।

লেজে লাল রঙ—একখানা ক্যারাভেল রেঙ্গুনের দিকে উড়ে যাচ্ছে। আমগাছের গুঁড়ির উঁচুতে পরগাছা তিন থাক বেগুনি ফুলটা অল্প অল্প বাতাসে কাঁপছিল আর ঠিক অপরাধীর মত একবার পৃথ্বীশ একবার রীতেশের দিকে তাকিয়ে সামান্য থেমে যাচ্ছিল।

দেখি কে আগে আনতে পারে—

নন্দার মুখে সেই হাসিটা যায় নি। তার ছু'পাশে ছু'জন পুরুষ-লোক মাথা নিচু করে শু খুলছিল। বিকেলের আলো এখনো খুব নরম হয় নি। মাঠে মাঠে খেলার দল। বেড়িয়ে বেড়াবার দল। বহু উঁচু দিয়ে একদল বক তাড়াতাড়ি ফিরছিল। নন্দা কোথায় যেন একটা আবিষ্কারের গন্ধ পাচ্ছিল। আবিষ্কারের আলো। তাতে নেশা ছিল। ছু' ছু'জন মানুষ এই মাত্র অশক্ত শরীরে—একদম অনিচ্ছায় তার আদেশে একটা বেগুনি রঙের তিনথাক ফুল আনতে যাবে। সে ফুল নন্দা খোঁপায় গুঁজে নেবে। এই বিকেলের আলোয় তখন তার মুখ, তার রূপ অন্য রকম হয়ে যাবে। এই বিকেলটা এখন তার কাছে বহুরূপা। আশ্চর্য! জীবনে এ রকমও ঘটে। একজন তার স্বামী বা মালিক। অন্যজন যা আর কি হতে হতে একটুর জন্যে হয় নি।

কোথায় অনিচ্ছা! নন্দাও অবাক হয়ে গেল। একজন খোঁড়াচ্ছিল। অন্যজন দৌড়তে দৌড়তে থেমে গিয়ে দম নিচ্ছে। ছু'টো জখম লোক যে এমন পড়িমড়ি করে ছুটে যেতে পারে তা কে ভেবেছিল।

চেঁচিয়ে বলে উঠল নন্দা, দেখি কে আগে আনতে পারে—বলতে বলতে সেই আবিষ্কারের আলোয়, গন্ধে, নেশায় নন্দা আপনা আপনি হাততালি দিয়ে উঠল।

আমগাছের কাছাকাছি গিয়ে রীতেশ দম নিচ্ছিল পৃথ্বীশ এসে পড়ল। ছু'জনই খালি পায়ে অনেকদিন দৌড়ায় নি। রীতেশ আগে ছুটে গিয়ে গাছটার গায়ে হাত দিয়ে বুঝলো—তার পক্ষে এ-গাছে ওঠা কঠিন। অসম্ভব। পা ভাল থাকলেও উঠতে গিয়ে হড়কে পড়ে যেত।

পৃথ্বীশ ছু'বার চেষ্টা করেও উঠতে পারল না।

তারপরেই নন্দা অবাক হয়ে দেখল, পৃথ্বীশ হাত ছু'খানা গাছের গুঁড়িতে সিঁড়ির মত করে পেতে দিয়েছে। তার ওপর দাঁড়িয়ে রীতেশ দিব্যি উঠে গেল। শেষে খুব সাবধানে টাল সামলে পৃথ্বীশের

কাঁধে পা রেখেই রীতেশ একেবারে উঁচু থেকে বেগুনি রঙের সেই পয়গাছা ফুলটা পেড়ে ফেলল।

এ তুমি কি করলে! পৃথ্বীশের নামটা আর মুখে এল না নন্দার। আবার বিড়বিড় করে বলে ফেলল, এ তুমি কি করলে?

আগে আগে রীতেশ আসছিল, হাতে সেই ফুলটা, পেছনে পৃথ্বীশ। ময়দানে লোকজন ছড়ানো ছিটানো।

নন্দা উঠে দাঁড়িয়ে মাথাটা পেছনে ঢেলে দিল। পরিয়ে দাও।

রীতেশের হাত উঠছিল না। সে পৃথ্বীশের দিকে তাকালো।

পৃথ্বীশ বলল, দিন না। দিন। আগে তো পরিয়ে দিয়েছেন।

কাঁপা হাতে কালো চুলের মস্ত খোঁপাটার খাঁজে রীতেশ তিন থাক বেগুনি ফুলটা গুঁজে দিতেই নন্দা ঘুরে মুখোমুখি দাঁড়াল, কেমন দেখাচ্ছে?

পৃথ্বীশ চোখ ফেরাতে পারছিল না। রীতেশও না। নন্দা তা বুঝতে পেরে আরও হাসিমুখে দু'জনের কাছাকাছি গিয়ে দাঁড়াল, তোমাদের ভেতর কে আমায় নেবে!

রীতেশ বুঝতে পারছিল না। এসব কি সত্য। না স্বপ্ন। সে ছোটবেলায় পিসিমাদের সঙ্গে বসে গোলকধাম খেলেছে। কড়ি খেলেছে। সেখানে দান বুঝে পতন ঘটত। আবার ভাল দান ফেলে 'বৈকুণ্ঠ' লাভ করেছে। এখানেও কি সে গোলকধামের কোর্ট পেতে খেলতে বসেছে।

পৃথ্বীশ মাঠে বসেই জুতো পরে ফেলল। নন্দার দিকে তার চোখই নেই। নন্দা তাই আরও বেশি করে রীতেশকে টানছিল। ওর হাত দু'খানা ধরেই নন্দা বলে উঠল, কি ভেবেছো! এখন আমরা বসে থাকব নাকি। চল যাই কোথাও।

রীতেশ আরও আড়ষ্ট হয়ে গেল। পৃথ্বীশ এখনো ফিতে বাঁধছে বুটের। কি সুন্দর লাথি মারতে পারে। কি সুন্দর কথা বলতে পারে।

গড়ের মাঠের ভেতরেও ঘাসে ঢাকা একটা পথ আছে। তার দু'ধারে সারি দিয়ে সাবু গাছ বসানো। গাছগুলো থামের মত উঠে দাঁড়ানো। ময়দানের এক এক জায়গায় হঠাৎ বিশ পঁচিশটা গাছের জটলা। আরও দূরে গাছপালার আড়ালে ফোর্ট উইলিয়ম। সন্ধ্যে হয়ে আসছিল। এখন মাঠের লোকজনকে অন্ধকারের ভেতর থেকে ছিঁড়ে ছিঁড়ে আলাদা করে না নিলে গুলিয়ে ফেলতে হয়।

পৃথ্বীশ জুতো পরে আস্তে হাঁটছিল। আগে আগে অনিচ্ছুক রীতেশকে নন্দা হাত ধরে টেনে নিয়ে চলেছে। রীতেশ বলল, একটু দাঁড়াও। আমি জুতোটা পরে নিই।

বেশ দাঁড়াচ্ছি। এরপর কিন্তু জোরে হাঁটতে হবে। আমরা গিয়ে কাঁচ লাগানো সেই দোতলা রেস্তোরাঁয় বসব। জানলা দিয়ে বেশ গঙ্গা দেখা যায়।

কলকাতায় থাকতে রীতেশ কয়েকবার কাঁচে ঘেরা দোতলায় বসে নন্দার সঙ্গে গঙ্গা দেখেছে কিন্তু সেসব তো অতীতের কথা। এখন কি করে তা আবার হয়? বিশেষত পৃথ্বীশকে না নিয়ে তো যাওয়া যায় না। কি সুন্দর লাথি মারেন ভদ্রলোক। কি সুন্দর কথা বলেন ভদ্রলোক।

রীতেশ জুতো পরে উঠে দাঁড়াল। আমি জোরে হাঁটতে পারব না। পায়ে ব্যথা।

কেন? দিব্যি তো ফুল পেড়ে আনলে!

নন্দার একথায় রীতেশ ভেতরে ভেতরে কেঁপে গেল। সে কি সত্যি ফুলটা পেড়েছে। এমন সময় অন্যমনস্ক পৃথ্বীশ ওদের ধরে ফেলল। বেশ আস্তেই হাঁটছিল পৃথ্বীশ। সে একবারও নন্দার দিকে তাকায় নি। নন্দাও তার দিকে আর তাকাচ্ছে না।

মাঠে আর লোক নেই। থাকলেও অন্ধকার তাদের ঢেকে ফেলেছিল। মাঠের মাঝে মাঝে ঘাসে ঢাকা জলপথ। সেসব জায়গা দেখে নামতে হয়। দেখে উঠতে হয়। আচমকা ঢালু।

চলুন পৃথ্বীশবাবু—গঙ্গার ধারে গিয়ে বসি।

রীতেশের কথায় পৃথ্বীশের হাঁটা থামলো না। সে কারো দিকে না তাকিয়েই হাঁটতে হাঁটতে বলল, আপনারা ঘুরে আসুন। আমি একটা ট্যাকসি ধরে নেব। এই মাঠটা পেরোলেই পেয়ে যাব—

রীতেশ মনে মনে বলল, আপনি না হলে ও ফুল আমি কিছুতেই পেড়ে আনাত পারতুম না। পেরে ভুল করেছি। আমি তো রসাতলের দাম খেলেছি। আমি আদৌ এ কোটের লোক নই।

কিন্তু এসব কথা তো মুখে বলা যায় না। তাই মানুষের মত করে বলল, একসঙ্গে এলাম। চলুন গঙ্গা দেখে একসঙ্গে ফিরব।

না। আমার রিহার্সেল আছে মনে ছিল না। তন্ময়দা বসে থাকবেন।

এবার নন্দা এগিয়ে এল। কাছেরই একটা টেণ্ট থেকে আলো এসে পড়ায় খোঁপার খাঁজে বসানো বেগুনি ফুলটা ঝকঝক করে উঠলো। আজ রিহার্সেল? কই বল নি তো আগে!

পৃথ্বীশ অবাক হয়ে তাকাল। তোমাকে আজকাল এসব আমি বলে থাকি নাকি!

নন্দা এতখানি ধাক্কা খাবার জন্যে তৈরি ছিল না।

লাইট, সাউণ্ড মিলিয়ে আজ আমাদের স্টেজ রিহার্সেল। মহারাষ্ট্র নিবাস তো ফাঁকা পাওয়া যায় না। শো লেগেই আছে।

নন্দা খুব ভীরু গলায় বলল, তা আজই একেবারে—

শোয়ের তো খুব দেরি নেই আর নন্দা। একথা বলেই পৃথ্বীশ হেসে বলল, আমার পুরনো কোন্ কথাটা তুমি জান?

নন্দার মনে পড়ে গেল, এই লোকটার সঙ্গে তার বিয়ে হয়েছে। সে অন্যমনস্ক হয়ে স্ত্রী হিসেবেই যেন জানতে গিয়েছিল, আজই রিহার্সেল? তা তো আমাকে বলো নি। কিন্তু এত কথা তার মুখে ফুটে ওঠে নি। কিংবা লজ্জায় বলতে পারি নি।

ঠিক এই সময়টায় রীতেশ বুঝলো, সে এখানে একেবারে বাইরের লোক। শুধু শুধু দাঁড়িয়ে আছে। তার কিছু করার নেই। ফিরে যাবারও উপায় নেই তার।

পৃথ্বীশ ট্যাকসি ধরবে বলে কাছাকাছি একটা রাস্তার আন্দাজ ধরে ময়দান ফুঁড়ে এলোমেলো এগোচ্ছিল। ওরা তিনজনই জানে ময়দান চিরে একটা পিচরাস্তা চলে গেছে বেহালা, খিদিরপুরের ট্রামলাইনের গা দিয়ে। কিন্তু সে রাস্তাটা যে এখন কোথায় আছে—এই অন্ধকারে ঠিক বোঝা যাচ্ছিল না। পৃথ্বীশ হাঁটছে বলে বাকি দু'জন থামতে পারছিল না। বিশেষত রীতেশ জানেই না—সে থামবে? না অন্য কোন দিকে চলে যাবে?

তিনজন পৃথক প্রাণী আন্দাজে অন্ধকারে একটা পিচ রাস্তার কথা মনে রেখে অসংলগ্ন পা ফেলছিল মাঠে। তাতে ইচ্ছা নেই। অনিচ্ছাও নেই। দূরে হেড লাইট জ্বালানো গাড়িগুলো বলে দিচ্ছিল—ওদিকে একটা রাস্তা আছে।

পৃথ্বীশ মনের ভেতরে ভেতরে অবাক হয়ে গেল। সত্যিই তো নন্দা আমার কোন কথাটা জানে? কোন্ কথাটা বোঝে? অথচ আমি ওর স্বামী। আমি নিজেকে বোঝাচ্ছিলাম—আমি ওর প্রোপ্রাইটর। মালিক। ওরফে স্বামী।

পৃথ্বীশ থেমে পড়ে একবার পেছনে তাকালো। দু'জন লোক। একজন নন্দা। একজন রীতেশ। অন্ধকারে যেন কোন খাড়াই পথ ভেঙে ওপরে উঠছে। পরিষ্কার বোঝা যায়—রীতেশের পিঠে বিরাট বোঝা। তা একেবারে অন্ধকারে মিশে গেছে। অথচ ওজন বোঝা যায়। টের পাওয়া যায়।

নন্দা আস্তে বলল, আমি কি সব জানি! তারপর আচমকাই পৃথ্বীশের হাত ধরে ফেলল, তুমি তো ইচ্ছে করলেই ফুলটা পেড়ে আনতে পারতে—

আমার ইচ্ছে করল না নন্দা।

পৃথ্বীশ দাঁড়িয়ে পড়তে ওরা দু'জনও দাঁড়িয়ে পড়ল। এই জবাবের জন্য কেউ তৈরি ছিল না।

রীতেশ বলতে যাচ্ছিল, ওভাবে ফুল পেড়ে আমার ভাল লাগে নি। পৃথ্বীশবাবু আপনি আমায় দয়া করেছেন।

কিন্তু সেকথা বলার কোন চান্স পেল না। তার আগেই নন্দা বলে বসল, তোমরা জয়েন্টলি ফুলটা পেড়েছো বলে ও ফুলটা আমার পরতে ভাল লাগছে না। এই নাও—

নন্দার হাতে অন্ধকারে একটা ফুল। খোঁপাটা এইমাত্র অন্ধকারে ভেঙে পড়ে খুলে গেল। আর সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকারে আর দেখাও যাচ্ছিল না ফুলটাকে। নন্দার হাত থেকে খসে মাটিতে পড়ে যেত।

পৃথ্বীশ তখুনি গম্ভীর গলায় বলল, ফেলে দিও না। তারপর আরও গম্ভীর গলায় বলল, ওভাবে ফুল পাড়তে তুমি বললে কেন? ওরকম শর্ত করে ভালবাসা হয় না নন্দা। ভালবাসা যায় না। অপমান লাগে। কোথাও যেন খিচ থেকে যায় একটা—

রীতেশের ইচ্ছে হচ্ছিল, এই লোকটাকে এখুনি আগাগোড়া শরীর দিয়ে জড়িয়ে ধরে।. এত সুন্দর লাথি মারে। কথা বলে। মানুষকে ভালবাসে। তার আর কোন দুঃখ নেই। আস্তে বলল, আপনি হাত এগিয়ে ধরলেন বলে আমি পেড়ে ফেললাম—

ঠিক করেছেন। আপনারা গঙ্গা দেখে তবে ফিরুন না। আমার যেতেই হবে। স্টেজ রিহার্সেলে কোনদিন অ্যাবসেন্ট থাকি নি।

নন্দাও জানে—রীতেশও জানে—গঙ্গায় আজ কিছু দেখার নেই তাদের। পৃথ্বীশও তা জানে নিশ্চয়। এমন অন্ধকারের মতই নদীর জল বয়ে যায়। তাতে না পড়ে ছায়া। তাতে না দেখা যায় মুখ। তবু ভাল—তার একটা আওয়াজ থাকে। অন্ধকারের মতো চোখের মধ্যে, মনের মধ্যে এমন চেপে বসে যায় না।

পৃথ্বীশ জোরে হেঁটে যাচ্ছিল। একা একা। খানিক পরেই আর দেখা যাবে না।

রীতেশ বুঝলো বেগুনি ফুল হাতে সদ্য বিবাহিতা এই পরস্ত্রী বড়ই একাকী—তবু তার কেউ নয়। এখানে ফেলে রেখে যাওয়া যায় না। অথচ পাশে দাঁড়িয়েও কোন লাভ নেই।

ফুলটা ফেলে দাও নন্দা। বড় অপয়া—

তবু হাতে নিয়ে নন্দা দাঁড়িয়ে আছে দেখে রীতেশ আবার কথা বলল, ফেলে দাও। সন্ধ্যেটাই মাটি করে দিল একটা পরগাছা বেগুনি ফুল। কোন গন্ধ নেই। বেয়াড়া রঙ—

তা কেন? বলেই নন্দা ফুল হাতে সাবধানে চুলের ঢাল গুটিয়ে খোঁপা বেঁধে নিল। নাও, পরিয়ে দাও এবারে—

রীতেশের হাত কাঁপছিল। আন্দাজে ফুলটা ধরতে গিয়ে নন্দার হাত ছুঁয়ে ফেলল। গরম লাগল যেন। তারপর খুব সাবধানে নতুন খোঁপার খাঁজে বসিয়ে দিল ফুলটাকে।

নন্দা টের পায় নি। তখনো মাথা সিধে করে দাঁড়ানো। রীতেশ খুব আলগোছে গন্ধ নিতে গিয়ে দেখলো বুনো, পরগাছা ফুলেরও একটা আলাদা বাস থাকে। তাকে সুবাস বলা যায় না। তবু—তার ভেতর দিয়ে বোঝা যায় না—এখন মাটির গন্ধ, লতার গন্ধ, শেকড়ের স্বাদ, বল্কলের স্বাদ টের পাওয়া যায়। অনেককালের পৃথিবী তার ভেতর দিয়ে উপচে পড়ে। অন্ধকার দিয়ে তাকে চাপা দেওয়া যায় না।

কাদের একটা টেণ্টের আলোয় নন্দার মুখখানা আবছা দেখা যাচ্ছিল এবার। কোন অ্যাথেলেটিক ক্লাব হবে। অফিসের পর এখন ওরা আলো জ্বালিয়ে ব্যাডমিণ্টন খেলবে। সবই বুঝতে পারছিল রীতেশ। শুধু একটা জিনিস তার পরিষ্কার হচ্ছিল না। নন্দার চোখে এখন কেন এমন করে জল এল।

তখনো আরেকজন ট্যাকসির রাস্তাটা খুঁজে পায় নি।